
তন্দ্রাবিলাস
হুমায়ূন আহমেদ

সেলিম চৌধুরী এবং তুহিন

মাঝে মাঝে চিন্তা করি—আমার এক জীবনের
সঞ্চয় কি? কিছু প্রিয় মুখ, কিছু সুখ স্মৃতি . . . . . .
প্রিয়মুখদের ভেতর তোমরা আছ। এই ব্যাপারটা
তোমাদের কাছে কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ আমি জানি না,



ভোর বেলায় মানুষের মেজাজ মোটামুটি ভাল থাকে। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে খারাপ হতে থাকে, বিকাল বেলায় মেজাজ সবচে বেশি খারাপ হয়, সন্ধ্যার পর আবার ভাল হতে থাকে। এটাই সাধারণ নিয়ম।

এখন সকাল এগারোটা, মেজাজের সাধারণ সূত্র মতে মিসির আলির মেজাজ ভাল থাকার কথা। কিন্তু মিসির আলির মন এই মুহূর্তে যথেষ্টই খারাপ। তিনি বসার ঘরে বেতের চেয়ারে পা তুলে বসে আছেন। তাঁর ভুরু কুঁচকে আছে। তাঁর মেজাজ খারাপের দু'টি কারণের প্রথমটা হল— একটা মাছি। অনেকক্ষণ থেকেই মাছিটা তাঁর গায়ে বসার চেষ্টা করছে। সাধারণ মাছি না— নীল রঙের স্বাস্থ্যবান ডুমো মাছি। আম-কাঁঠালের সময় এই মাছিগুলিকে দেখা যায়। এখন শীতকাল— এই মাছি এল কোত্থেকে? মাছিটা তার গায়েই বার বার বসতে চাচ্ছে কেন? তাঁর সামনে বসে থাকা মেয়েটির গায়ে কেন বসছে না?

মিসির আলির মেজাজ খারাপের দ্বিতীয় কারণ এই মেয়েটি। তাঁর ইচ্ছা করছে মেয়েটিকে একটা ধমক দেন। যদিও ধমক দেবার মত কোনও কারণ ঘটেনি। মেয়েটি তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। দেখা করতে আসার অপরাধে কাউকে ধমক দেয়া যায় না। ধমক দেয়ার বদলে মিসির আলি শব্দ করে কাশলেন। প্রচন্ড শব্দে কাশলে, কিংবা কুৎসিত শব্দে নাক ঝাড়লে মনের রাগ অনেকখানি কমে। মিসির আলির কমল না বরং আরও যেন বাড়ল। মাছিটাও মনে হচ্ছে এই শব্দে উৎসাহ পেয়েছে। এতক্ষণ গায়ে বসতে চাচ্ছিল এখন উড়ে ঠোঁটে বসতে চাচ্ছে। কি যন্ত্রণা!

স্যার, আমার নাম সায়রা বানু। সায়রা বানু নামটা কি আপনার মনে থাকবে?

মিসির আলি বললেন, মনে থাকার প্রয়োজন কি আছে?

অবশ্যই আছে। আমি এত আগ্রহ করে আমার নামটা আপনাকে কেন বলছি, যাতে মনে থাকে সেই জন্যেই তো বলছি।

মিসির আলি রোবটের গলায় বললেন, মানুষের নাম আমার মনে থাকে না।

মেয়েটি তাঁর রোবট গলা অগ্রাহ্য করে হাসি মুখে বলল, আমারটা মনে থাকবে। কারণ একজন বিখ্যাত সিনেমা অভিনেত্রীর নাম সায়রা বানু।

মিসির আলি ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে আছেন। এখন তাঁর মাথার যন্ত্রণা শুরু হয়েছে। অর্থহীন কথা শুনতে ভাল লাগছে না। তা ছাড়া শীতও লাগছে। চেয়ারটা টেনে রোদে নিয়ে গেলে হয়। তাতে কিছুক্ষণ আরাম লাগবে তারপর আবার রোদে গা চিড়বিড় করতে থাকবে। শীতকালের এই এক যন্ত্রণা। ছায়া বা রোদ কোনটাই ভাল লাগে না। মিসির আলি মাছিটার দিকে তাকিয়ে রইলেন। মাছিটার কারণে নিজেকে এখন কাঁঠাল কাঁঠাল মনে হচ্ছে।

মেয়েটি খানিকটা মাথা ঝুঁকিয়ে বলল, আপনি দিলীপ কুমার, সায়রা বানু এদের নাম শোনেন নি?

দিলীপ কুমারের নাম শুনেছি।

সায়রা বানু হচ্ছে দিলীপ কুমারের বউ। আমার বন্ধুরা অবশ্যি আমাকে সায়রা বানু ডাকে না, তারা ডাকে এস বি। সায়রার এস, বানুর বি—এস বি। এস বি তে আর কি হয় বলুন তো?

বলতে পারছি না।

এস বি হচ্ছে স্পেশাল ব্রাঞ্চ। আমার বন্ধুদের ধারণা আমার চেহারায় একটা স্পাই স্পাই ভাব আছে। এই জন্যেই তারা আমাকে এস বি ডাকে। আচ্ছা আপনারও কি ধারণা আমার চেহারায় স্পাই স্পাই ভাব? ভাল করে একটু আমার দিকে তাকান না। আপনি সারাক্ষণ এদিক ওদিক তাকাচ্ছেন কেন?

মিসির আলি এদিক ওদিক তাকাচ্ছেন না। মাছিটার দিকে তাকিয়ে আছেন। মাছিটা এদিক ওদিক করছে বলেই এদিক ওদিক তাকাতে হচ্ছে। আচ্ছা পৃথিবীতে মোট কত প্রজাতির মাছি আছে?

এই যে শুনুন। তাকান আমার দিকে।

মিসির আলি মেয়েটির দিকে তাকালেন। অতিরিক্ত ফর্সা একটি মেয়ে। বাঙ্গালী মেয়েদের গায়ের রঙের একটা মাত্রা আছে। কোনও মেয়ে যদি সেই মাত্রা অতিক্রম করে যায় তখন আর ভাল লাগে না। তার মধ্যে বিদেশী বিদেশী ভাব চলে আসে। তাকে তখন আর আপন মনে হয় না। সায়রা বানুর ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। তাকে পর পর লাগছে। মেয়েটির মাথা ভর্তি চুল। সেই চুলেও লালচে ভাব আছে। অতিরিক্ত ফর্সা মেয়েদের ক্ষেত্রে তাই হয়। তাদের গায়ের রঙের খানিকটা এসে চুলে লেগে যায়। চুল লালচে দেখায়— খানিকটা এসে লাগে চোখে। চোখ তখন আর

কালো মনে হয় না। মেয়েটির মুখ লম্বাটে। একটু বোঁচা ধরনের নাক। বোঁচা নাক থাকায় রক্ষা—বোঁচা নাকের কারণেই মেয়েটিকে বাঙ্গালী মনে হচ্ছে। খাড়া নাক হলে মেডিটেরিনিয়ান সমুদ্রের পাশের গ্রীক কন্যা বলে মনে হত। বয়স কত হবে? উনিশ থেকে পঁচিশের ভেতর। মানুষের বয়স চট করে ধরতে পারার কোনও পদ্ধতি থাকলে ভাল হত। গাছের রিং গুনে বয়স বলা যায়। মানুষের তেমন কিছু নেই। মানুষের বয়স তার মনে বলেই বোধ হয়। আচ্ছা, একটা মাছি কতদিন বাঁচে?

স্যার কথা বলছেন না কেন? আমাকে কি স্পাই মেয়ে বলে মনে হচ্ছে?

স্পাই মেয়েদের চেহারা আলাদা হয় বলে আমি জানি না।

একটু আলাদা হয়। স্পাই মেয়েদের মুখ দেখে এদের মনের ভাব বোঝা যায় না। এদের মুখে এক রকম ভাব মনের ভেতর আরেক রকম।

তোমারও কি তাই?

জ্বি। ও আপনাকে বলতে ভুলে গেছি এস বি ছাড়াও আমার আরেকটা নাম আছে। নাম ঠিক না খেতাব। নববর্ষে পাওয়া খেতাব। আমাদের কলেজে পহেলা বৈশাখে খেতাব দেয়া হয়। আমার খেতাবটা হচ্ছে সাদা বাঘিনী। এস বি তে সাদা বাঘিনীও হয়। সাদা বাঘিনী টাইটেল কেন পেয়েছিলাম শুনতে চান? খুবই মজার গল্প।

মিসির আলি তাকিয়ে রইলেন। তাঁর কিছুই শুনতে ইচ্ছা করছে না। মাথার যন্ত্রণা এবং শীত ভাব দুইই বাড়ছে। গায়ে পাতলা একটা চাদর দিয়ে শীত ভাবটা কমান যেত। চাদরটা ধুবিখানায় দিয়েছেন। ধোয়া নিশ্চয়ই হয়ে গেছে, স্লিপের অভাবে আনতে পারছেন না। স্লিপটা কোথাও খুঁজে পাচ্ছেন না। কড়া এক কাপ চা খেলেও শীতটা কমত। ঘরে চায়ের পাতা আছে, চিনি, দুধও আছে। গত কালই কিনে এনেছেন। কিন্তু গ্যাসের চুলায় কি একটা সমস্যা হচ্ছে। কিছুক্ষণ আগুন জ্বলেই হুস করে নিভে যায়। মিস্ত্রী ডাকিয়ে চুলা ঠিক করা দরকার। গ্যাস মিস্ত্রীরা কোথায় থাকে কে জানে?

সায়রা বানু মেয়েটি হড়বড় করে কথা বলে যাচ্ছে, তার কথা তিনি মন দিয়ে শুনছেন না। মাথায় দুশ্চিন্তা নিয়ে অন্য কিছুতে মন বসান বেশ কঠিন। তবে মাছিটা এখন শান্ত হয়েছে। টেবিলের উপর চুপ করে বসে আছে। ডিম পাড়ছে না তো?

আমার সাদা বাঘিনী টাইটেল পাওয়ার ঘটনাটা খুব ইন্টারেস্টিং। শুনলে আপনি খুব মজা পাবেন। বলব?

মিসির আলি কিছুই বললেন না। তিনি খুব ভাল করেই জানেন মেয়েটি তার গল্প বলবেই। তিনি বলতে বললেও বলবে, বলতে না বললেও বলবে।

==========================================

হয়েছে কি শুনুন— সায়েন্স ল্যাবরেটরীর সামনে দিয়ে আমি যাচ্ছি। আমার সঙ্গে আমার এক বন্ধু, রাকা। রাকা হচ্ছে বোরকাওয়ালী। বোরকা পরে। সউদি বোরকা। বেশ কয়েক টাইপ বোরকা পাওয়া যায় তা কি আপনি জানেন? সউদি বোরকা, পাকিস্তানী বোরকা। সউদি বোরকা ভয়াবহ, শুধু চোখ দু'টো বের হয়ে থাকে। এমনিতে সে অবশ্যি খুব স্টাইলিস্ট। বোরকার নীচে স্লিভলেস ব্লাউজ পরে। যাই হোক বোরকাওয়ালী রাকা হঠাৎ বলল, সে একটা পেনসিল কিনবে। আমি তাকে নিয়ে একটা দোকানে ঢুকলাম পেনসিল কিনতে। স্টেশনারীর দোকান তবে তার সঙ্গে কনফেকশনারীও আছে। চা বিক্রি হচ্ছে। কেক বিক্রি হচ্ছে। দোকানটায় বেশ ভিড়। ভিড়ের সুযোগ নিয়ে এক লোক করল কি বোরকাওয়ালীর গায়ে হাত দিল। গায়ে মানে কোথায় তা আপনাকে বলতে পারব না। আমার লজ্জা লাগবে। বোরকাওয়ালী এমন ভয় পেল যে প্রায় অচেতন হয়ে পরে যাচ্ছিল। আমি বোরকাওয়ালীকে ধরে ফেললাম তারপর বদমাশ লোকটার দিকে তাকিয়ে বললাম, আপনি ওর গায়ে হাত দিলেন কেন? ষন্ডা গন্ডা টাইপের লোক। লাল চোখ। গরিলাদের মত লোম ভর্তি হাত। সে এমন ভাব করল যে আমার কথাই শুনতে পায়নি। দোকানদারের দিকে তাকিয়ে হাই তুলতে তুলতে বলল—দেখি একটা লেবু চা। তখন আমি খপ করে তার হাত ধরে ফেললাম। সে ঝটকা দিয়ে তার হাত ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করল কিন্তু তার আগেই আমি তার হাত কামড়ে ধরলাম। যাকে বলে কচ্ছপের কামড়। কচ্ছপের কামড় কি তা নিশ্চয়ই আপনি জানেন। কচ্ছপ একবার কামড়ে ধরলে আর ছাড়ে না। আমিও ছাড়লাম না। আমার মুখ রক্তে ভরে গেল। লোকটা বিকট চিৎকার শুরু করল। ব্যাপার স্যাপার দেখে বোরকাওয়ালী অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। এর পর থেকে আমার টাইটেল হয়েছে সাদা বাঘিনী। গল্প শেষ করে সায়রা বানু খিলখিল করে হাসছে। মিসির আলি মেয়েটির হাসির মাঝখানেই বললেন, তুমি আমার কাছে কেন এসেছ?

গল্প করার জন্যে এসেছি। বিখ্যাত মানুষের সঙ্গে গল্প করতে আমার খুব ভাল লাগে।

আমি বিখ্যাত মানুষ?

অবশ্যই বিখ্যাত। আপনাকে নিয়ে কত বই লেখা হয়েছে। আমি অবশ্যি একটা মাত্র বই পড়েছি। ঐ যে সুধাকান্ত বাবুর গল্প। একটা মেয়ে খুন হল আর আপনি কেমন শার্লক হোমসের মত বের করে ফেললেন— সুধাকান্ত বাবুই খুনটা করেছেন। বই পড়ে মনে হচ্ছিল আপনার খুব বুদ্ধি কিন্তু আপনাকে দেখে সেরকম মনে হচ্ছে না।

==================================================

আমাকে দেখে কেমন মনে হচ্ছে?

খুব সাধারণ মনে হচ্ছে। আপনার মধ্যে একটা গৃহ শিক্ষক গৃহ শিক্ষক ব্যাপার আছে। আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে আপনি নিয়মিত বেতন পান না এমন একজন অংকের স্যার। আপনি রোজ ভাবেন আজ বেতনের কথাটা বলবেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত সাহস করে বলতে পারেন না। আচ্ছা আপনি এমন গম্ভীর মুখে বসে আছেন কেন? মনে হচ্ছে আপনি আমার কথা শুনে মজা তো পাচ্ছেনই না উল্টো বিরক্ত হচ্ছেন। সত্যি করে বলুন আপনি কি বিরক্ত হচ্ছেন?

কিছুটা হচ্ছি।

মাছিটা তো এখন আর বিরক্ত করছে না। কেমন শান্ত হয়ে টেবিলে বসে আছে। তারপরেও আপনি এত বিরক্ত কেন বলুন তো?

তুমি অকারণে কথা বলছ এই জন্যে বিরক্ত হচ্ছি। অকারণ কথা আমি নিজেও বলতে পারি না অন্যের অকারণ কথা শুনতেও ভাল লাগে না।

আপনার সঙ্গে কথা বলতে হলে সবসময় একটা কারণ লাগবে? তাহলে তো আপনি খুবই বোরিং একটা মানুষ। এত কারণ আমি পাব কোথায় যে আমি রোজ রোজ আপনার সঙ্গে কথা বলব?

মিসির আলি বিস্মিত হয়ে বললেন, তুমি রোজ রোজ আমার সঙ্গে কথা বলবে?

হুঁ।

সে কি, কেন?

সায়রা বানু খুব সহজ ভঙ্গিতে হাই তুলতে তুলতে বলল, এক বাড়িতে থাকতে হলে কথা বলতে হবে না?

এক বাড়িতে থাকবে মানে? আমি বুঝতে পারছি না।

আমি আপনার সঙ্গে কয়েকটা দিন থাকব। ক'দিন এখনও বলতে পারছি না। দু'দিনও হতে পারে আবার দু'মাসও হতে পারে। আবার দু'বছরও হতে পারে। সম্পূর্ণ নির্ভর করছে আপনার উপর।

মিসির আলি চেয়ার থেকে পা নামিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মেয়েটির দিকে তাকালেন। হচ্ছেটা কি? এই যুগের টিনএজার মেয়েদের ভাব ভঙ্গি, কান্ড কারখানা বোঝা মুশকিল। তারা যে কোন উদ্ভট কিছু হাসি মুখে করে ফেলতে পারে। মেয়েটি হয়ত অতি তুচ্ছ কারণে রাগ করে বাড়ি থেকে বের হয়ে এসেছে। কিংবা তাকে ভড়কে দেবার জন্যে গল্প ফেঁদেছে। পরে কলেজে বন্ধুদের কাছে এই গল্প করবে। বন্ধুরা মজা পেয়ে একে অন্যের গায়ে হেসে গড়িয়ে পড়বে। — ও মাগো বুড়োটাকে

কি বোকা বানিয়েছি! সে বিশ্বাস করে ফেলেছিল যে আমি থাকতে এসেছে।

মিসির আলি নিজের বিস্ময় গোপন করে সহজ ভাবে বললেন, তুমি এ বাড়িতে থাকবে?

জ্বি।

বিছানা বালিশ নিয়ে এসেছ?

বিছানা বালিশ আনিনি। আজকাল তো আর বিছানা বালিশ নিয়ে কেউ অন্যের বাড়িতে থাকতে যায় না। শুধু একটা স্যুটকেস আর হ্যান্ডব্যাগ এনেছি। আর একটা পানির বোতল।

স্যুটকেস আর হ্যান্ডব্যাগ কোথায়?

বারান্দায় রেখে এসেছি। শুরুতেই আপনি আমার স্যুটকেস দেখে ফেললে ঢুকতে দিতেন না। যাই হোক আমি এখন আমার স্যুটকেস আর হ্যান্ডব্যাগ নিয়ে আসছি। আচ্ছা আপনি এমন ভাব করছেন যেন আকাশ থেকে পড়েছেন। আকাশ থেকে পড়ার মত কিছু হয় নি। বিপদগ্রস্ত একজন তরুণীকে কয়েক দিনের জন্যে আশ্রয় দেয়া এমন কোনও বড় অন্যায় না। আমি নিশ্চিত এরচে অনেক বড় বড় অন্যায় আপনি করেছেন।

তুমি সত্যি সত্যি আমার এখানে থাকার পরিকল্পনা নিয়ে এসেছ?

জ্বি।

মিসির আলি তাকিয়ে রইলেন। এই মুহূর্তে তাঁর ঠিক কি করা উচিত তা মাথায় আসছে না। কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে মেয়েটির কান্ডকারখানা দেখাই মনে হয় সবচে বুদ্ধিমানের কাজ হবে। মেয়েটি বুদ্ধিমতি। এই পরিস্থিতিতে তিনি কি করবেন বা করতে পারেন সেই সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা সে নিশ্চয়ই করেছে। নিজেকে সম্ভাব্য সব রকম পরিস্থিতির জন্যে সে প্রস্তুত করে রেখেছে। মিসির আলির এমন কিছু করতে হবে যার সম্পর্কে মেয়েটির প্রস্তুতি নেই। সে কেন বাড়ি ছেড়ে এসেছে এই মুহূর্তে তা তাকে জিজ্ঞেস করা যাবে না। কারণ এই প্রশ্নটি স্বাভাবিক এবং সংগত প্রশ্ন। এই প্রশ্নের উত্তর মেয়েটি তৈরি করে রেখেছে। তাঁর বিস্মিত হওয়াও ঠিক হবে না। তাঁকে খুব সহজ এবং স্বাভাবিক থাকতে হবে। যেন এমন ঘটনা প্রতি সপ্তাহেই দু'টা একটা করে ঘটছে।

সায়রা বানু স্যুটকেস, হ্যান্ডব্যাগ নিয়ে ঘরে ঢুকল। মিসির আলি বিস্মিত হয়ে লক্ষ্য করলেন সে গুন গুন করে কি একটা গানের সুরও যেন ভাজছে। কত সহজ স্বাভাবিক তার আচরণ।

কেক খাবেন?

==========================================

কেক ?

হুঁ। আমার নিজের বেক করা, ডিমের পরিমাণ বেশি হয়েছে বলে একটু ডিম ডিম গন্ধ হয়ে গেছে। অনেকে ডিমের গন্ধ একেবারে সহ্য করতে পারে না। আমার কাছে অবশ্যি খারাপ লাগে না। দেব আপনাকে এক পিস কেক ?

না।

আপনাকে একটু বাজারে যেতে হবে, কয়েকটা জিনিস কিনতে হবে। আমি অতি দ্রুত চলে এসেছি তো কাজেই অনেক প্রয়োজনীয় জিনিস আনা হয়নি। টুথপেস্ট এনেছি, টুথব্রাশ আনিনি। আমার অভ্যাস হচ্ছে রাতে শোবার সময় কুট কুট করে কয়েকটা লবঙ্গ খাওয়া। লবঙ্গ খেলে শরীরের রক্ত পরিস্কার থাকে, কখনও হার্টের অসুখ হয় না। সেই লবঙ্গ আনা হয়নি। আপনাকে লবঙ্গ আনতে হবে। পারবেন ? আমি আপনাকে টাকা দিয়ে দেব। আমি সঙ্গে করে অনেক টাকা নিয়ে এসেছি। বলুন তো কত এনেছি।

বলতে পারছি না।

অনুমান করুন। আপনি হচ্ছেন বিখ্যাত মিসির আলি। আপনার অনুমান হবে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ অনুমান। বলুন আমার সঙ্গে কত টাকা আছে ?

পাঁচ হাজার টাকা।

হয়নি। আমার সঙ্গে আছে মোট একান্ন হাজার টাকা। পাঁচশ টাকার একটা বান্ডিল এনেছি আর এনেছি দশ টাকার একটা বান্ডিল। সেখান থেকে কিছু খরচ করেছি। বেবী টেক্সি ভাড়া দিয়েছি তিরিশ টাকা। ঠিক এই মুহূর্তে আমার কাছে আছে পঞ্চাশ হাজার নয়শ সত্তর টাকা। আপনাকে টুকটাক বাজারের জন্যে পাঁচশ টাকা দিচ্ছি, যা লাগে খরচ করবেন বাকিটা ফেরত দেবেন। এই নিন।

সায়রা বানু তার কাঁধে ঝুলান কালো ব্যাগ খুলে টাকা বের করল। মিসির আলি টাকাটা নিলেন। মেয়েটি এক ধরনের খেলা শুরু করেছে। মিসির আলির মনে হল মেয়েটিকে সেই খেলা তার মতই খেলতে দেয়া উচিত। এই মুহূর্তে এমন কিছু করা ঠিক হবে না যাতে খেলা বাধাগ্রস্ত হয়। তিনি মেয়েটিকে আগ্রহ নিয়ে দেখতে শুরু করেছেন—তার তাকানোর ভঙ্গি, হাঁটার ভঙ্গি, বসার ভঙ্গি। আপাত দৃষ্টিতে এইসব খুবই ছোট খাট ব্যাপার থেকে অনেক কিছু জানা যায়।

সায়রা বানু চেয়ারে বসতে বসতে বলল, আমার খাওয়া নিয়ে আপনি মোটেই চিন্তা করবেন না। যা খাওয়াবেন আমি তাই খাব। শুধু মাছ ছাড়া। মাছ আমি খেতে পারি না—গন্ধ লাগে। অবশ্যি চিংড়ি মাছ খাই। চিংড়ি মাছ কেন খাই বলুন তো ?

বলতে পারছি না।

চিংড়ি মাছ খাই কারণ চিংড়ি মাছ হচ্ছে আসলে এক ধরনের পোকা। পোকা বলেই চিংড়ি মাছে আশটে গন্ধ নেই। ও আচ্ছা বলতে ভুলে গেছি। আরেকটা জিনিস খুব পছন্দ করে খাই। ইলিশ মাছের ডিম।

মাছের ডিমেরও তো আশটে গন্ধ থাকে।

ইলিশ মাছের ডিমে থাকে না। আপনি কেভিয়ার খেয়েছেন?

না।

কেভিয়ার হচ্ছে পৃথিবীর সবচে দামি খাবার। কালো রঙের মাছের ডিম। স্বাদ কি রকম জানেন?

যেহেতু খাইনি স্বাদ কেমন তা তো জানার কথা না।

স্বাদ কেমন আপনি জানেন। অনেকটা আমাদের শিং মাছের ডিমের মত। তবে আশটে গন্ধ অনেক বেশি। নাক চেপে ধরে আমি একবার খানিকটা খেয়েছিলাম তারপর বমি টমি করে একাকার।

মিসির আলি পাঞ্জাবির পকেট থেকে সিগারেট বের করলেন। সঙ্গে দেয়াশলাই নেই। দেয়াশলাইয়ের খোঁজে রান্নাঘরে যেতে হবে। চেয়ার ছেড়ে উঠতে ইচ্ছা করছে না। মেয়েটাকে কি বলবেন দেয়াশলাই এনে দিতে? মিসির আলিকে কিছু বলতে হল না। তার আগেই সায়রা বানু বলল, আপনার লাইটার লাগবে?

আছে তোমার কাছে?

আছে। আপনি সিগারেট মুখে দিন আমি ধরিয়ে দিচ্ছি।

মেয়েটা যে ভঙ্গিতে লাইটার ধরাল তাতে মনে হল সিগারেট ধরিয়ে দিয়ে তার অভ্যাস আছে। সে নিজে সিগারেট খায় না তো? না খায় না, সিগারেটের ধোঁয়ায় সে নাক কুঁচকাচ্ছে।

এই লাইটারটা আপনি রেখে দিন। লাইটারটা আমি আপনার জন্যে এনেছি।

থ্যাংক য়্যু।

আর এক প্যাকেট সিগারেটও এনেছি। আপনার একটা বইয়ে পড়েছিলাম একজন কে আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসতো। যেদিনই আসতো আপনার জন্যে এক প্যাকেট সিগারেট নিয়ে আসতো।

মিসির আলি সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে বললেন, একটু আগে বলেছিলে তুমি আমার একটা বইই পড়েছ।

মিথ্যা কথা বলেছিলাম। অনেকগুলি বই পড়েছি। সুধাকান্ত বাবুর উপর লেখা বইটা সবচে ভাল লেগেছে। ঐটা আমি পড়েছি তিনবার। না তিনবার না। আড়াইবার পড়েছি। দুবার পড়েছি পুরোটা। শেষ বার পড়েছি শুধু শেষের কুড়ি পাতা।

=================================================

ভাল।

মিথ্যা কথা বললে কি আপনি রেগে যান?

না।

আমাকে কেউ মিথ্যা কথা বললে আমি অবশ্যি খুব রেগে যাই। আর আমার এমনই কপাল যে সবাই শুধু আমার সঙ্গে মিথ্যা কথা বলে। তবে আপনি বলবেন না সেটা আমি জানি। আপনার চেহারা দেখেই বোঝা যায় আপনি মিথ্যা কথা বলতে পারেন না। আপনি কি জানেন যারা সবসময় মিথ্যা কথা বলে তাদের চেহারায় একটা মাই ডিয়ার ভাব থাকে।

তাই না কি?

জ্বি।

যেসব মেয়েকে দেখবেন খুব মায়া মায়া চেহারা, আপনি ধরেই নিতে পারেন তারা প্রচুর মিথ্যা কথা বলে।

এই তথ্য জানতাম না।

আপনি মিসির আলি আর আপনি এই সাধারণ তথ্য জানেন না? অথচ বইয়ে কত আশ্চর্য আশ্চর্য কথা যে আপনার সম্পর্কে লেখা হয়। যেমন কাউকে এক পলক দেখেই আপনি তার সম্পর্কে হড়বড় অনেক কথা বলে দিতে পারেন। আসলেই কি পারেন?

না। পারি না।

আচ্ছা চেষ্টা করে দেখুন না। আমার সম্পর্কে বলুন।

কি বলব?

আমাকে দেখে কি মনে হচ্ছে। এইসব। দেখি আপনার পাওয়ার অব অবজারবেশন।

দেখ সায়রা বানু, আমি পরীক্ষা দেই না।

পরীক্ষা ভাবছেন কেন? ভাবেন একটা খেলা। বলুন আমার সম্পর্কে বলুন।

মিসির আলি হাতের সিগারেট ফেলে দিলেন। আরেকটা সিগারেট ধরাতে ইচ্ছা করছে। তিনি নিজের উপর একটু বিরক্ত হচ্ছেন কারণ তাঁর টেনশান হচ্ছে। টেনশান হলেই একটা সিগারেট শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা সিগারেট ধরাতে ইচ্ছা করে। তাঁর শরীর ভাল না। এখন কিছু দিন টেনশান ফ্রি জীবন যাপন করতে চান। অজানা অচেনা একটা মেয়ে হুট করে উপস্থিত হয়ে তাতে বাধা দিচ্ছে।

মেয়েটি আগ্রহ নিয়ে বলল, কি হল কিছু বলছেন না কেন?

মিসির আলি খানিকটা বিরক্তি নিয়ে বললেন, তোমার সম্পর্কে আমার প্রথম

=========================================

অবজারভেশন হচ্ছে তোমার নাম সায়রা বানু নয়।

এরকম মনে হবার কারণ কি?

মনে হবার কারণ হচ্ছে— সায়রা বানু যদি তোমার নাম হত তাহলে সায়রা বানু ডাকলে তুমি সহজ ভাবে রেসপন্স করতে। একটু আগে আমি বললাম, দেখ সায়রা বানু পরীক্ষা আমি দেই না। বাক্যটা আমি একবারে বলিনি। দেখ সায়রা বানু, বলে কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করেছি। যখন দেখলাম তুমি হঠাৎ চমকে উঠলে তখনি আমি বাক্যটা শেষ করলাম। তোমার চমকে ওঠার কারণ হচ্ছে সায়রা বানু বলে যে তোমাকে সম্বোধন করা হচ্ছে তা তুমি শুরুতে বুঝতে পারনি। যখন বুঝতে পেরেছ তখনই চমকে উঠেছ। তোমার নাম কি?

আমার নাম চিত্রা।

তোমার সম্পর্কে আমার দ্বিতীয় অবজারভেশন হচ্ছে তোমাকে দীর্ঘ দিন একটা ঘরে আটকে রাখা হয়েছিল। সেই ঘরের জানালা পর্যন্ত বন্ধ ছিল। আলোহীন একটা ঘরে দীর্ঘদিন থাকলে গায়ের চামড়া ফ্যাকাসে হয়ে যায়। তোমার তাই হয়েছে। তুমি আলোর দিকে ঠিক মত তাকাতেও পারছ না। যতবার তাকাচ্ছ ততবার চোখের মণি ছোট হয়ে আসছে। ভুরু কুঁচকে যাচ্ছে। আবার জানালা থেকে তুমি চোখ ফিরিয়েও নিতে পারছ না। বার বার বিস্মিত চোখে জানালা দিয়ে তাকাচ্ছ। কারণ অনেকদিন পরে তুমি জানালায় খোলা আকাশ দেখছ।

আরও কিছু বলবেন?

দীর্ঘদিন ধরে তুমি ক্রমাগত মিথ্যা কথা বলে যাচ্ছ। যে কোনও কারণেই হোক তোমাকে মিথ্যা কথা বলতে হচ্ছে। স্টোরি তৈরি করতে হচ্ছে। মিথ্যা বলাটা তোমার অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি কি ঠিক বলেছি?

হ্যাঁ।

তোমার হাত বাঁধা ছিল। মণিবন্ধে কালো দাগ পড়ে গেছে।

হুঁ।

তোমার ঘ্রাণ শক্তি অতি প্রবল। তুমি কিছুক্ষণ পরপরই নাক কুঁচকাচ্ছ। এবং তাকাচ্ছ ঘরের দক্ষিণ দিকে। দক্ষিণ দিক থেকে নর্দমার দুর্গন্ধ আসছে। সেটা এত প্রবল না যে এমন ভাবে নাক কুঁচকাতে হবে। এর থেকে মনে হয়—হয় তোমার ঘ্রাণ শক্তি অত্যন্ত প্রবল আর নয়ত তোমাকে অনেক উঁচু কোনও ঘরে আটকে রাখা হয়েছে, ছ' তলা সাত তলায় যেখানে রাস্তার নর্দমার গন্ধ পৌঁছে না।

চিত্রা চুপ করে রইল। সে খুব একটা বিস্মিত হল বলে মনে হল না। মিসির আলি বললেন, এখন বল তোমার ব্যাপারটা কি?

আপনি তো কিছু না জেনেই অনেক কিছু বলতে পারেন। আপনি নিজেই বলুন।

না আমি বলতে পারছি না।

অনুমান করুন। দেখি আপনার অনুমান শক্তি আমার ঘ্রাণ শক্তির মত কি না।

আমার ধারণা তুমি অসুস্থ। অসুস্থতাটা এমন যে রোগীকে ঘরে আটকে রাখতে হয়। তুমি কোন ক্রমে ছাড়া পেয়ে পালিয়ে এসেছ।

আপনি কি বলতে চাচ্ছেন যে আমি পাগল তাই আমাকে ঘরে আটকে রাখা হয়েছিল? না আমি পাগল না। সুস্থ। ছিটে ফোঁটা পাগলামী যা অন্যদের মধ্যে থাকে আমার তাও নেই। তবে আমাকে ঘরে আটকা রাখা হচ্ছিল তা ঠিক। ছাব্বিশ দিন হল ঘরে তালাবন্ধ। আমাকে সবাই মিলে ঘরে তালাবন্ধ করে রেখেছে। কারণটাও খুব সাধারণ এবং আপনার মত বুড়োর কাছে হয়ত বা হাস্যকর। কারণটা বলব?

মিসির আলি হ্যাঁ না কিছুই বললেন না। মেয়েটির স্বভাব যা তাতে তিনি যদি বলেন — হ্যাঁ বল — তাহলে সে নিশ্চিত ভাবেই বলবে—না বলব না। তারচে চুপ করে থাকাই ভাল।

ব্যাপারটা প্রেম ঘটিত। আমি একটা ছেলেকে বিয়ে করতে চাই। দরিদ্র ফালতু টাইপ ছেলে। কিছুই করে না। তার প্রেমে পড়ার কারণ নেই। তারপরেও আমি পড়ে গেছি এবং এবং . .

এবং কি?

গোপনে বিয়ে করার জন্যে তার সঙ্গে পালিয়েও গিয়েছিলাম। আমাকে ধরে আনা হয়। আমি তো খুব জেদি মেয়ে, কাজেই আমি সবাইকে বলি— আমি আবারও পালিয়ে যাব। তোমাদের কোনও সাধ্য নেই আমাকে ধরে রাখার।

ছেলেটার নাম কি?

ছেলেটার নাম দিয়ে আপনার দরকার কি?

কোনও দরকার নেই। কৌতূহল বলতে পার।

উনার নাম ফরহাদ।

শুধুই ফরহাদ?

ফরহাদ খান।

তারপর?

তারপর আবার কি?

তোমার কাছ থেকে এই কথা শোনার পর তারা তোমাকে তালাবন্ধ করে

========================================

রাখল?

তাই তো রাখবে। যে মেয়ে এ জাতীয় কথা বলে তাকে নিশ্চয়ই কেউ কোলে করে ঘুরে বেড়াবে না। ঘুম পাড়ানি গান গাইয়ে ঘুম পাড়াবে না।

আজ তুমি ছাড়া পেয়েছ, আমার কাছে না এসে ঐ ছেলেটির কাছে চলে যাচ্ছ না কেন?

যাব তো বটেই। আপনার কি ধারণা আমি চিরকালের জন্যে আপনার সঙ্গে থাকব?

মিসির আলি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, চিত্রা তুমি আবারও মিথ্যা কথা বলছ।

বুঝলেন কি করে?

ছেলেটার নাম কি বল জিজ্ঞেস করার পর— থতমত খেয়ে গেলে। চট করে বলতে পারলে না। একটা কোনও নাম ভাবার জন্যে সময় নিলে। তারপর বললে উনার নাম ফরহাদ। উনি বললে— যাকে বিয়ে করতে যাচ্ছ তার প্রসঙ্গে উনি বলবে কেন? বলবে ওর নাম ফরহাদ।

তাহলে কি সত্যি কথা শুনতে চান?

আমি এখন সত্যি মিথ্যা কোনও কথাই শুনতে চাই না। তুমি আমার সাহায্য চাচ্ছ। যদি সত্যি চাও আমি তোমাকে সাহায্য করি, তাহলে তোমাকে সত্যি কথা বলতে হবে। তা তুমি পারবে না। মিথ্যা বলাটা তোমার রক্তের মধ্যে ঢুকে গেছে। কিছুক্ষণ সত্যি বলার পর আবার মিথ্যা শুরু করবে।

তাতে অসুবিধা কি? যেই মুহূর্তে আমি মিথ্যা বলব আপনি ধরে ফেলবেন। আপনার তো সেই ক্ষমতা আছে।

মিসির আলি আরেকটি সিগারেট ধরিয়ে গম্ভীর গলায় বললেন— চিত্রা শোন আমার পক্ষে তোমাকে এ বাড়িতে রাখা সম্ভব না। তোমাকে চলে যেতে হবে। এবং কিছুক্ষণের মধ্যে চলে যেতে হবে।

আমার সমস্যা আপনি সমাধান করবেন না?

মানুষের বেশির ভাগ সমস্যাই এরকম যে তা তারা নিজেরাই সমাধান করতে পারে। আমার ধারণা তোমার সমস্যার সমাধান তুমিই করতে পারবে।

আমি আপনার সঙ্গে মিথ্যা কথা বলেছি বলে কি আপনি রাগ করেছেন?

রাগ করার প্রশ্ন আসছে না। মিথ্যা কথা বলাটাকে সবাই যতবড় অন্যায় মনে করে আমি তা করি না। আমার কাছে মনে হয় মানুষের অনেক অদ্ভুত ক্ষমতার একটি হচ্ছে মিথ্যা বলার ক্ষমতা। কল্পনা শক্তি আছে বলেই সে মিথ্যা বলতে পারে।

যে মানুষ মিথ্যা বলতে পারে না সে সৃষ্টিশীল মানুষ না—রোবট টাইপ মানুষ।

আপনি কি মিথ্যা বলেন?

না বলি না। মানুষ হিসেবে আমি রোবট টাইপের। শোন চিত্রা, তুমি এখন চলে যাও।

চিত্রা বিস্মিত গলায় বলল, চলে যাব?

হ্যাঁ চলে যাবে।

আপনি আমাকে খুব অপছন্দ করেছেন তাই না?

আমি তোমাকে অপছন্দও করিনি আবার পছন্দও করিনি।

আমার বিষয়ে আপনার কোনও কৌতূহলও হচ্ছে না?

লোকজনের ধারণা আমার কৌতূহল খুব বেশি, আসলে তা না। আমার কৌতূহল কম। অনেক কম।

নীল রঙের মাছিটার দিকে আপনি যতটা কৌতূহল নিয়ে তাকিয়েছেন আমার দিকে তাও তাকান নি। আমি কি মাছির চেয়েও তুচ্ছ?

মিসির আলি চুপ করে রইলেন।

চিত্রা ক্লান্ত গলায় বলল, আচ্ছা আমি চলে যাচ্ছি। কিন্তু আপনি দয়া করে গম্ভীর হয়ে থাকবেন না। যাবার আগে হাসি মুখে থাকুন। আপনার হাসি মুখ দেখে যাই।

মিসির আলি হাসলেন। চিত্রা বলল, বাহ্‌ আপনার হাসি তো সুন্দর। যারা গম্ভীর ধরনের মানুষ তাদের হাসি খুব সুন্দর হয়। এরা হঠাৎ হঠাৎ হাসে তো এই জন্যে। আর যারা সবসময় হাসি মুখে থাকে তাদের হাসি হয় খুব বিরক্তিকর। তাদের কান্না হয় সুন্দর। আচ্ছা আমি তাহলে এখন উঠি।

চিত্রা উঠে দাঁড়াল। মেয়েটা এত সহজে চলে যেতে রাজি হবে তা মিসির আলি ভাবেন নি। তিনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

আচ্ছা শুনুন, আমি আমার ব্যাগগুলি রেখে যাই। ব্যাগ হাতে মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে আশ্রয় খোঁজার তো কোনও মানে হয় না, তাই না?

বিছানা বালিশ নিয়ে যাওয়াই তো ভাল, সবাই ভাববে এই মেয়ের আসলেই আশ্রয় প্রয়োজন।

আপনি কিন্তু সেরকম ভাবেন নি। আপনি আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছেন। যাই হোক আমি জিনিস পত্র রেখে যাচ্ছি। একসময় এসে নিয়ে যাব।

আচ্ছা।

আপনি আসলেই রোবট টাইপ মানুষ। যাই কেমন?

===========================================

তুমি কি তোমার বাড়ির টেলিফোন নাম্বারটি দিয়ে যাবে?

কেন? আচ্ছা দিচ্ছি। কাগজে লিখে দিচ্ছি। নিতান্ত প্রয়োজন না হলে টেলিফোন করবেন না। আর যদি করেন আপনি ভয়াবহ বিপদে পড়ে যাবেন। এইবার কিন্তু আমি সত্যি কথা বলছি— কি বলছি না?

মনে হচ্ছে বলছ।

চিত্রা তার হ্যান্ডব্যাগ থেকে কাগজ নিয়ে টেলিফোন নাম্বার লিখল। ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বলল, এই নিন নাম্বার। আবারও বলছি নিতান্ত প্রয়োজন না হলে টেলিফোন করবেন না।

নিতান্ত প্রয়োজন বলতে তুমি কি বুঝাচ্ছ?

ধরুন আমি আপনার ঘর থেকে বের হলাম। আর হঠাৎ একটা ট্রাক এসে আমার গায়ের উপর দিয়ে চলে গেল তখন আপনি বাসায় টেলিফোন করে বলবেন– চিত্রা মারা গেছে।

আচ্ছা ঠিক আছে।

চিত্রা বেশ সহজ ভঙ্গিতেই বের হল। মিসির আলি উঠে দরজা বন্ধ করে দিলেন। তিনি আজ আর ঘর থেকে বের হবেন না। তিনি জানেন ঘন্টা দু' একের ভেতর চিত্রা ফিরে আসবে, তার জিনিসপত্র নিয়ে যাবে। মেয়েরা তাদের ব্যক্তিগত জিনিসপত্র কোথাও রেখে স্বস্তি পায় না। কাজেই অপেক্ষা করাই ভাল।

খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার মেয়েটি চলে যাবার পর মিসির আলির একটু মন খারাপ হয়ে গেল। পাখি উড়ে যাবার পর পাখির পালক পড়ে থাকে। মেয়েটা চলে গেছে তার পরেও কিছু যেন রেখে গেছে। স্যুটকেস এবং হ্যান্ডব্যাগ নয়, অন্য কিছু।

মেয়েটির রেখে যাওয়া ৫০০ টাকার নোটটা পকেটে। টাকাটা ফেরত দিতে ভুলে গেছেন। আশ্চর্য কাণ্ড— মেয়েটি তার কালো ব্যাগও ফেলে গেছে। তার সব টাকা তো ঐ ব্যাগে। বেবী টেক্সি নিয়ে যদি কোথাও যায় ভাড়া দিতে পারবে না।

মিসির আলি অস্বস্তি বোধ করছেন। মেয়েটাকে মাথা থেকে তাড়াতে পারছেন না। মাছিটা এখনও টেবিলে বসে আছে। মারা গেছে নাকি? না মারা যায়নি। কীট এবং পতঙ্গ জগতের নিয়ম হল মৃত্যুর পর উল্টো হয়ে থাকা। পিঠ থাকবে মাটিতে পা থাকবে শূন্যে। মাছির বেলাতেও নিশ্চয়ই সেই নিয়ম। মিসির আলি তার লাইব্রেরির দিকে এগুলেন— মাছি সম্পর্কে জানার জন্যে কোনও বই কি আছে লাইব্রেরিতে? থাকার তো কথা।

মাছি সম্পর্কে মিসির আলি তেমন কোনও তথ্য জোগাড় করতে পারলেন না। শুধু জানলেন পৃথিবীতে মোট ৮৫,০০০ প্রজাতির মাছি আছে। মৌমাছি যেমন

==================================================

মাছি, ড্রাগন ফ্লাইও মাছি। সবচে ছোট মাছি প্রায় অদৃশ্য আর সবচে বড় মাছি চড়ুই পাখি সাইজের। এদের সবারই দু'জোড়া পাখা থাকে। এক জোড়া তারা ওড়ার কাজে ব্যবহার করে— অন্য জোড়া ভারসাম্য বজায় রাখতে ব্যবহার করে। বেশির ভাগ প্রজাতির মাছিই মানুষের পরম বন্ধু—শুধু হাউস ফ্লাই নয়। এদের প্রধান কাজ অসুখ ছড়ান।

==========================================



চিত্রা দু' ঘন্টার ভেতর ফিরে আসবে এ ব্যাপারে মিসির আলি নিশ্চিত ছিলেন। নিশ্চিত ব্যাপারগুলি মানুষের জীবনে প্রায় কখনও ঘটে না। চিত্রা দু' ঘন্টা কেন দশ দিনের মাথাতেও ফিরে এল না। তার হ্যান্ডব্যাগ এবং স্যুটকেসে ধুলা জমতে লাগল। সে একটা টেলিফোন নাম্বার দিয়ে গিয়েছিল। টেলিফোন নাম্বার লেখা চিরকুট তিনি ড্রয়ারে যত্ন করে রেখে দিয়েছিলেন। অযত্নে অবহেলায় রাখা কাগজপত্র সবসময় পাওয়া যায়। যত্নে রাখা কাগজ কখনও পাওয়া যায় না। মারফির এই সূত্র ভুল প্রমানিত হল। মিসির আলি ড্রয়ার খুলেই চিরকুটটি পেলেন এবং সেই চিরকুট দেখে তিনি ছোটখাট একটা চমক খেলেন। চিরকুটে টেলিফোন নাম্বার লেখা নেই। শুধু সুন্দর অক্ষরে লেখা Help me!

মিসির আলির একটু মন খারাপ হল। মেয়েটির সমস্যার কথা মন দিয়ে শুনলেই হত। তিনি এতটা অধৈর্য হলেন কেন? বাড়ি ঘর ছেড়ে নিতান্ত অকারণে এই বয়সের একটা মেয়ে চলে আসে না। এই বয়সের মেয়েদের মাথায় নানান উদ্ভট ব্যাপার খেলা করে তারপরেও বাড়ি ঘর ছাড়ার ব্যাপারে তারা খুব সাবধানী হয়। আশ্রয় মেয়েদের কাছে অনেক বড় ব্যাপার। প্রকৃতি মেয়েদের সেই ভাবেই তৈরি করেছে। ভবিষ্যতে এরা সন্তানের জন্ম দেবে। সেই জন্যে তাদের নিরাপদ আশ্রয় দরকার। কাজেই "হে মাতৃজাতি তোমরা আশ্রয় কখনো ছাড়বে না" এই হল ডি এন এ'র অনুশাসন। ডি এন এ অনুশাসনের বাইরে যাবার ক্ষমতা তাদের নেই।

মেয়েটি তার সঙ্গে যোগাযোগের কোনও পথ রাখেনি। পথ রাখলে তিনি বলতেন— হ্যাঁ আমি এখন তোমার কথা শুনব। সত্যি মিথ্যা সব কথাই শুনব। আগের বারে তোমার কথা শুনতে চাইনি। তোমার হাত থেকে রক্ষা পাবার ব্যাপারটাই আমার মাথায় প্রবল ভাবে ছিল। তার জন্যে আমি দুঃখিত।

মেয়েটি তার হ্যান্ডব্যাগ বা স্যুটকেসে কোনও ঠিকানা কি রেখে গেছে?

=====================================================

স্যুটকেস খুললে কোনও গল্পের বই কি পাওয়া যাবে যেখানে তার নাম এবং বাড়ির ঠিকানা লেখা? বই পেলেও লাভ হবে না। এখনকার মেয়েরা বই-এ নিজের নাম লিখলেও বাড়ির ঠিকানা লেখে না। বাড়ির ঠিকানা লেখাটাকে গ্রাম্যতা বলে ধরা হয়। ডায়েরি পেলে সবচে ভাল হত। ডায়েরিতে নাম ঠিকানা থাকে। তবে ডায়েরি পাবার সম্ভাবনা অতি সামান্য। আজকালকার মেয়েদের ডায়েরি লেখার মত সময় নেই। নিজেদের কথা তারা শুধু গোপন করতে চায়। লিখতে চায় না।

মিসির আলি মেয়েটির স্যুটকেস খুললেন। কয়েকটা শাড়ি, পলিথিনে মোড়া দু' জোড়া স্যান্ডেল, হেয়ার ড্রায়ার, ট্রাভেলার্স আয়রন, কিছু কসমেটিকস, এক বোতল পানি, সুন্দর একটা চায়ের কাপ। একটা ফুলতোলা বেডশীট।

বই এবং ডায়েরি পাওয়া গেল না। তবে বেডশীটের নীচে এক গাদা কাগজ পাওয়া গেল। দামী ওনিয়ন স্কিন পেপার। কাগজে চিকন নিবের কালির কলমে গুটি গুটি করে ঠাস বুনন লেখা। যত্ন করে কেউ অনেক দিন ধরে লিখেছে। মনে হচ্ছে দীর্ঘ কোনও চিঠি। কাকে লেখা? মিসির আলি ভুরু কুঁচকে সম্বোধন পড়লেন,

শ্রদ্ধাস্পদেষু

জনাব মিসির আলি সাহেব।

চিঠিতে তারিখ নেই। যে লিখছে তার নামও নেই। এর হাতের লেখা এবং চিত্রার হাতের লেখা কি এক? ফিঙ্গার প্রিন্ট এক্সপার্ট ছাড়া বলা যাবে না। চিত্রা ইংরেজিতে লিখেছে হেল্প মি, আর এই দীর্ঘ চিঠি লেখা বাংলায়। ইংরেজি এবং বাংলা হাতের লেখায় মিল-অমিল চট করে চোখে পড়ে না। তার পরেও মিসির আলির মনে হল দীর্ঘ এই চিঠির লেখিকা এবং চিত্রা এক মেয়ে নয়।

মেয়েটি বাইরে যাবার প্রস্তুতি নিয়ে তার ব্যাগগোছায় নি। মেয়েরা ব্যাগ গুছানোর সময় অবশ্যই প্রথম নেবে আন্ডার গার্মেন্টস, পেটিকোট, ব্লাউজ, ব্রা, প্যান্টি। এইসব কাপড়ের ব্যাপারে তারা অতিরিক্ত সেনসেটিভ। ব্যাগে আগে এইসব গুছান হবে তারপর অন্য কিছু। কিন্তু মেয়েটির স্যুটকেস বা হ্যান্ডব্যাগে এইসব কিছু নেই। টাওয়েলও নেই। মেয়েটি ঘর ছাড়ার জন্যে ব্যাগ গোছায় নি। তার অন্য কোনও উদ্দেশ্য আছে। সেই উদ্দেশ্য কি তাকে দীর্ঘ চিঠিটা নাটকীয় ভঙ্গিতে দেয়া?

==========================================



---

শ্রদ্ধাস্পদেষু

জনাব আপনাকে কেমন ভড়কে দিলাম। সরাসরি চিঠিটা আপনার কাছে দিলে আপনি এত আগ্রহ নিয়ে পড়তেন না। কাজেই সামান্য নাটক করতে হল। আশা করি আমার এই ছেলেমানুষি নাটকে আপনি বিরক্ত হন নি।

আমি আপনাকে চিনি না। আপনার সঙ্গে আমার কখনও দেখা হয় নি। আপনার সম্পর্কে যা জানি বই পড়ে জানি। বইয়ে লেখকরা সব কিছু ঠিকঠাক লিখতে পারেন না। মূল চরিত্রগুলিকে তারা মহিমান্বিত করার চেষ্টা করেন। আমি ধরেই নিয়েছি আপনার বেলাতেও তাই হয়েছে। বইয়ের মিসির আলি এবং ব্যক্তি মিসির আলি এক নন। কে জানে আপনি হয়ত বইয়ের মিসির আলির চেয়েও ভাল মানুষ।

আমি আপনার সম্পর্কে মনে মনে একটা ছবি দাঁড় করিয়েছি—আচ্ছা দেখুন তো সেই ছবিটার সঙ্গে কতটুক মেলে। তারও আগে একটা ব্যাপার পরিষ্কার করে নেই। আমার ধারণা আপনি এখন ভুরু কুঁচকে ভাবছেন, চিঠির মেয়ে এবং চিত্রা কি এক? ব্যাপারটা আমি ধীরে ধীরে পরিষ্কার করব। আপাতত আপনি এটা নিয়ে চিন্তা করবেন না। আপনাকে লেখা চিঠিটা মন দিয়ে পড়ুন। এই চিঠি আমি দু' বছর ধরে রাত জেগে লিখেছি। অসংখ্য বার কাটাকুটি করেছি। বানান ঠিক করেছি। যেন চিঠি পড়ে আপনি কখনও বিরক্ত হয়ে না ভাবেন—মেয়েটা এই সহজ বানানও জানে না! আশ্চর্য তো!

ভাল কথা আপনার সম্পর্কে আমার ধারণা কি এখন বলি, দেখুন তো মেলে কি না। আমার ধারণা আপনি হাসি খুশি ধরনের মানুষ। বইয়ে আপনার যে গম্ভীর প্রকৃতির কথা লেখা হয় সেটা ঠিক না। আপনার চেহারার যে বর্ণনা বইয়ে থাকে সেটাও ঠিক না। আপনার বিশেষত্বহীন চেহারার কথা লেখা হলেও আমি জানি আপনার চেহারা মোটেও বিশেষত্বহীন নয়। আপনার চোখ ধারাল ও তীব্র। সার্চ

লাইটের মত। তবে সেই ধারাল চোখেও একটা শান্তি শান্তি ভাব আছে। আমার খুব ইচ্ছা কোনও একদিন আপনাকে এসে দেখে যাব। শান্ত ভঙ্গিতে আপনার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকব। এক সময় আপনাকে বলব, আমাকে একটা হাসির গল্প বলুন তো। আমার কেন জানি মনে হয় কেউ আপনার কাছে গল্প শুনতে আসে না। সবাই আসে ভয়ংকর সব সমস্যা নিয়ে। দিনের পর দিন এই সব সমস্যা শুনতে কি আপনার ভাল লাগে? মাঝে মাঝে আপনার কি ইচ্ছা করে না সহজ স্বাভাবিক গল্প শুনতে এবং বলতে? যেমন আপনি একটা ভূতের গল্প শুনে ভয় পাবেন। ভুরু কুঁচকে ভাববেন না— ভূত বলে কিছু নেই।

আমাদের চার পাশের জগৎটা সহজ স্বাভাবিক জগৎ, এই জগৎ–এ মাঝে মাঝে বিচিত্র এবং ভয়ংকর কান্ড ঘটে। আমার নিজের জীবনেই ঘটে গেল। এবং আমি আপনাকে সেই গল্পই শুনাতে বসেছি। না শুনালেও চলত। কারণ আমি আপনার কাছ থেকে কোনও সাহায্য চাচ্ছি না। বা আপনাকে বলছি না আপনি আমার সমস্যার সমাধান করে দিন। তারপরেও সব মানুষেরই বোধ হয় ইচ্ছা করে নিজের কথা কাউকে না কাউকে শুনাতে । আমার চারপাশে তেমন কেউ নেই।

এখন আমি আপনার একটা অস্বস্তি দূর করি। চিত্রা নামের যে মেয়েটি আপনার কাছে এসেছিল আমি সেই মেয়ে। কাজেই আপনার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। চিত্রার সেদিন আপনাকে কেমন লেগেছিল তা আর আপনাকে কোনদিন জানান হবে না। কারণ চিত্রার সঙ্গে আপনার আর কোনদিন দেখা হবে না। আপনাকে খানিকটা ধাঁধায় ফেলে চিত্রা বিদেয় নিয়েছে। আমিও বিদায় নেব। আমার দীর্ঘ চিঠি শেষ করার পর আপনি ভাববেন—আচ্ছা মেয়েটার কি মাথা খারাপ? সে এইসব কি লিখেছে? কেনই বা লিখেছে? দীর্ঘ লেখা পড়তে আপনার যেন ক্লান্তি না লাগে সে জন্যে আমি খুব চেষ্টা করেছি। চেষ্টা কতটুকু সফল হল কে জানে। চ্যাপ্টার দিয়ে দিয়ে লিখলাম। চ্যাপ্টারের প্রথম কয়েক লাইন পড়ে আপনি ঠিক করবেন আপনি পড়বেন কি পড়বেন না। সব চ্যাপ্টার যে পড়তেই হবে তা না।

পরিচয়

নাম ঃ চিত্রা (নকল নাম)।

বয়স ঃ ২৩ বছর। (যখন লেখা শুরু করেছিলাম তখন বয়স ছিল ২০ বছর তিন মাস)।

উচ্চতা ঃ পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি।

আমার প্রিয় রঙ ঃ চাঁপা।

আমার দেখতে ভাল লাগে ঃ চাঁদ এবং পানি।

=======================================

পড়াশোনা ঃ এস এস সি পাশ করার পর আর পড়াশোনা করতে পারি নি। তবে আমি খুব পড়ুয়া মেয়ে। শত শত বই পড়ে ফেলেছি। শুধু গল্পের বই না। সব ধরনের বই। বাড়িতে আমি যেন পড়তে পারি সে জন্যে আমার একজন শিক্ষক আছেন। দর্শনবিদ্যার শিক্ষক। তবে দর্শন আমার প্রিয় বিষয় নয়।

আমি কেমন মেয়ে ? ভাল মেয়ে। খুব ভাল মেয়ে। আপনি নিশ্চয়ই মনে মনে হাসছেন। ভাবছেন এই মেয়েটা এমন ছেলেমানুষি করছে কেন? আমি তো আসলে ছেলে মানুষই। ২৩ বছর তো এমন কোনও বয়স না তাই না? তবে আমি কিন্তু আসলেই ভাল মেয়ে।

দূর ছাই লেখার এই ধরনটা আমার ভাল লাগছে না। আমি বরং ধারাবাহিক ভাবে শুরু করি। পড়তে পড়তে আমার সম্পর্কে আপনার ধীরে ধীরে একটা ধারণা তৈরি হবে। তখন আর আমাকে বলতে হবে না যে আমি ভাল মেয়ে। আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন।

খুব অল্প বয়সে রোড অ্যাকসিডেন্টে আমার মা মারা যান। বান্দরবান থেকে একটা জীপে করে আমরা আসছিলাম। আমার বাবা গাড়ি চালাচ্ছিলেন। বাবার পাশে মা বসেছিলেন। মা'র কোলে আমি। হঠাৎ গাড়ির সামনে একটা ছাগল পড়ল। বাবা সেই ছাগল বাঁচাতে গিয়ে গাড়ি নিয়ে খাদে পড়ে গেলেন। মা তৎক্ষণাৎ মারা গেলেন। আমার এবং বাবার কিছু হল না। বান্দরবানের রাস্তাগুলি খুব নির্জন থাকে। অ্যাকসিডেন্টের অনেক পড়ে লোকজন এসে আমাদের উদ্ধার করল। আমার তখন বয়স মাত্র দেড় বছর। আমার কিচ্ছু মনে নেই।

আমার বাবা পরে আবার বিয়ে করেন। সেই বিয়ে সুখের হয়নি। ছোট মা'র মেজাজ খুব খারাপ ছিল। তিনি অল্পতেই রেগে যেতেন। তাঁর আত্মহত্যার প্রবণতা ছিল। বাবার সঙ্গে রাগারাগি হলেই বলতেন, সুইসাইড করব। শেষ পর্যন্ত মা সুইসাইড করেন। এই নিয়ে খুব ঝামেলা হয়। মা পক্ষের লোকজন মামলা করেন। তারা বলার চেষ্টা করেন মাকে মেরে ফেলা হয়েছে। যাই হোক মামলায় প্রমাণিত হয়, মা মানসিক রোগী ছিলেন। ছোট মা দেখতে খুব সুন্দর ছিলেন। গায়ের রঙ অবশ্যি শ্যামলা ছিল। কিন্তু তার চেহারা এতই মিষ্টি ছিল—শুধু তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করত।

আপনি বুঝতেই পারছেন আমার শৈশবটা সুখের ছিল না। একটা বিরাট বাড়িতে আমি প্রায় একা একাই মানুষ হই। আমাদের বাড়িটা ছিল টু ইউনিট। একতলায় রান্নাঘর, খাবার ঘর, বসার ঘর, স্টাডি আর দোতলায় শুধুই শোবার ঘর আর ফ্যামিলি লাউঞ্জ। কাজের লোকদের দোতলায় ওঠা নিষেধ ছিল। তারা সবাই

==========================================

বাবাকে ভয় পেত বলে দোতলায় উঠত না। আমি স্কুল থেকে ফিরে একা একাই দোতলায় খেলতাম। আমার মত বাচ্চারা মনে মনে একজন খেলার সাথি তৈরি করে নেয়, তার সঙ্গেই খেলে। আমিও তাই করলাম। একজন খেলার সাথি বানিয়ে নিলাম। সেই খেলার সাথি হল আমার মা। আমার ছোট মা। আমার আসল মাকে তো আমি দেখিনি, কাজেই তার সম্পর্কে আমার কোন মমতা বা ভালবাসা কিছুই ছিল না। ছোট মা আমাকে খুবই আদর করতেন। সেই আদরের একটা ছোট্ট নমুনা দিলেই আপনি বুঝবেন। যেমন মনে করুন তিনি আমাকে ডাকছেন—চিত্রা খেতে এস। চিত্রা বলার আগে তিনি একগাদা আদরের নাম অতি দ্রুত বলে যাবেন। তারপর বলবেন খেতে এস। তাঁর আদরের নাম গুলি হল–

ভিটভিটি খিটখিটি,
মিটমিটি ফিটফিটি
ভুভুন খুনখুন
সুনসুন ঝুনঝুন।
এ্যাং বেঙ ঝেং, টেঙ টেঙ।

আদরের নাম ছাড়াও তাঁর নিজের কিছু কিছু বিচিত্র ছড়াও ছিল। ননসেন্স রাইমের মত কোনও অর্থ নেই, কোনও মানে নেই। সেই সব ছড়া তিনি গানের সুরে বলতেন। সব সুর এক রকম। যেমন ধরুন—

ফানিম্যান হাসে তার
রং ঢং হাসি।
জানা কথা যে জানে না
না শুনে সে বাঁশি।

এইসব বিচিত্র ছড়া বলে তিনি খিলখিল করে হাসতেন। আমার খুবই মজা লাগত। মনে হত আহ কি আনন্দময় আমার জীবন।

অতি আদরের একজন মানুষ আমার খেলার সাথি হবে এটাই স্বাভাবিক। আমি নিজের মনে পুতুল খেলতাম, রান্নাবাটি খেলতাম এবং ক্রমাগত ছোট মায়ের সাথে কথা বলতাম, প্রশ্ন করতাম, ছোট মা উত্তর দিতেন। উত্তর তো আসলে দিতেন

=====================================================

না। আমি উত্তরটা কল্পনা করে নিতাম। তখন আমার বয়স সাত। সাত বছরের বাচ্চারা এই ধরনের খেলা খেলে। এটা তেমন অস্বাভাবিক কিছু না। কিন্তু একদিন একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার ঘটল। সেদিন স্কুল ছুটি ছিল। বাবা গেছেন ঢাকার বাইরে। আমি সারাদিন একা একা খেলেছি।

সন্ধ্যাবেলা আমার শরীর খারাপ করল। গা কেঁপে জ্বর এল। আমি চাদর গায়ে বিছানায় শুয়ে আছি। কিচ্ছু ভাল লাগছে না। খাট থেকে একটু দূরে আমার পড়ার টেবিল। টেবিলে বাবার এনে দেয়া মোটা একটা ইংরেজি ছবির বই। শুয়ে শুয়ে ছবি দেখতে ইচ্ছা করল। বিছানা থেকে নেমে যে ছবির বইটা আনব সেই ইচ্ছা করছে না। আমি অভ্যাস মত বললাম, ছোট মা বইটা এনে দাও। কল্পনার খেলার সাথি মাকে এই জাতীয় অনুরোধ আমি প্রায়ই করি। সেই অনুরোধ আমি নিজেই পালন করি। তারপর বলি, থ্যাংক ইউ ছোট মা। ছোট মা'র হয়ে আমি প্রায়ই বলি, ইউ আর ওয়েল কাম।

সেদিন সন্ধ্যায় অন্য ব্যাপার হল। অবাক হয়ে দেখলাম ছোট মা টেবিলের দিকে যাচ্ছেন। বইটা হাতে নিয়ে বিছানার দিকে ফিরছেন। বইটা আমার দিকে ধরে আছেন। আমি এতই অবাক হয়েছি যে হাত বাড়িয়ে বইটা নিতে পর্যন্ত ভুলে গেছি। ছোট মা আমার বিছানার পাশে বইটা রেখে নিঃশব্দে বের হয়ে গেলেন। খোলা দরজাটা হাত দিয়ে ভিড়িয়ে দিয়ে গেলেন। ভয়ে আমার চিৎকার করে ওঠা উচিত ছিল। আমি চিৎকার করলাম না। ভয়ের চেয়ে বিস্ময়বোধই আমার প্রবল ছিল। চোখে ভুল দেখেছি এই জাতীয় চিন্তা আমার একবারও মনে আসে নি। বরং মনে হয়েছে আমি যা দেখছি ঠিকই দেখছি। ছোট মা আমাকে দেখতে এসেছেন। আমার শরীর ভাল না তো এই জন্যে আমাকে দেখতে এসেছেন।

নিঃসঙ্গ শিশুরা তার চার পাশের জগৎ সম্পর্কে অনেক ব্যাখ্যা নিজেরা দাঁড় করায়। আমিও একটা ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়ে ফেললাম। এই ব্যাখ্যায় অসুস্থ শিশুকে দেখতে মৃত মানুষ ফিরে আসতে পারেন।

যদিও আমি নিজেই একটা ব্যাখ্যা দাঁড় করালাম তারপরেও আমার মনে হল এই ব্যাখ্যায় কিছু ফাঁকি আছে। ফাঁকির ব্যাপারটা আমি নিজে জানতে চাচ্ছিলাম না। কাজেই মাকে দেখতে পাওয়ার কথাটা কাউকে বললাম না। আমার মনে হল পুরো ব্যাপারটায় এক ধরনের গোপনীয়তা আছে। কেউ জেনে ফেললে মা রাগ করবেন, তিনি আর আসবেন না।

সেই রাতে আমার জ্বর খুব বাড়ল । মাথায় পানি দেওয়া হল। তাতে কাজ হল না। বাথটাবে বরফ মেশান ঠাণ্ডা পানিতে আমাকে ডুবিয়ে রাখা হল। ডাক্তার

=======================================

ডাকা হল। চিটাগাং –এ আমার বাবাকে জরুরি খবর পাঠান হল। আমার খুব ভাল লাগতে লাগল এই ভেবে যে, যেহেতু আমার শরীর খুব খারাপ করেছে আমার ছোট মা নিশ্চয়ই আবারও আমাকে দেখতে আসবেন। আমি খুব আগ্রহ নিয়ে তাঁর জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম। ছোট মা অবশ্যি এলেন না।

আমার এই ঘটনা শুনে আপনি কি ভাবছেন তা আমি জানি। আপনি ভাবছেন হেলুসিনেশন। একটি নিঃসঙ্গ শিশু তার নিঃসঙ্গতা দূর করার জন্যে নিজের মধ্যে একটি জগৎ সৃষ্টি করেছে। হেলুসিনেশনের জন্ম সেই জগতে। আপনারা সাইকিয়াট্রিস্টরা খুব সহজেই সব কিছু ব্যাখ্যা করে ফেলেন। আপনাদের কাছে রহস্য বলে কিছু নেই। আইনস্টাইন যখন বলেন সৃষ্টি রহস্যময়, সব রহস্যের জট এই মুহূর্তে খোলা সম্ভব না তখন আপনারা বলেন, ব্যাখ্যাতীত বলে কিছু নেই। সব কিছু ব্যাখ্যা করা যায়। আমার এক জীবনে আমাকে অনেক সাইকো এনালিসিসের ভেতর দিয়ে যেতে হয়েছে। আমি এই সব ব্যাপার খুব ভাল জানি। আপনাদের মত মনোবিদ্যা বিশারদদের দেখলে আমার সত্যিকার অর্থেই হাসি পায়। আপনারা একেকজন কি গম্ভীর ভঙ্গিতে কথা বলেন, যেন পৃথিবীর সব কিছু জেনে বসে আছেন। অল্প বিদ্যা ভয়ংকর হয়। আপনাদের বিদ্যা শুধু যে অল্প তাই না, শূন্য বিদ্যা।

আপনি কি রাগ করছেন?

দয়া করে রাগ করবেন না। আমি জানি আপনি অন্যদের মত না। আপনি আপনার সীমারেখা জানেন। প্রকৃতি মানুষের চারদিকে একটা গন্ডি একে দিয়ে বলে দেয়— এর বাইরে তুমি যেতে পারবে না। তোমার অতি উন্নত জ্ঞান বিজ্ঞান নিয়েও তোমাকে থাকতে হবে এই গন্ডির ভেতর। এই সত্য আপনার জানা আছে। আপনি গন্ডি ভেতর থেকেও গন্ডি অতিক্রম করতে চেষ্টা করেন। এই খানেই আপনার বাহাদুরি। বড় বড় কথা বলছি? হয়ত বলছি। তবে এগুলি আমার নিজের কথা না। অন্য একজনের কথা। সেই অন্য একজন প্রচুর জ্ঞানের কথা বলেন এবং খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বলেন। তিনি যে জ্ঞানের কথা বলছেন তা তখন মনে হয় না। একটু চিন্তা করলেই মনে হয় ওরে বাবারে— এ তো অসম্ভব জ্ঞানের কথা। এই প্রসঙ্গে আমি পরে বলব। তবে আপনি হচ্ছেন মিসির আলি, কে জানে ইতিমধ্যে হয়ত অনেক কিছু বুঝে ফেলেছেন।

আপনি কি ভাবে চিন্তা ভাবনা করে একটা সমস্যার সমাধানের দিকে এগোন তা আমার জানতে ইচ্ছা করে। চিন্তা শক্তি আমার নিজের খুবই কম। সহজ রহস্যই ধরতে পারি না। আমাদের স্কুলে একবার একজন ম্যাজিশিয়ান ম্যাজিক দেখাতে

================================================

এসেছিলেন। বেচারী খুবই আনাড়ী ধরনের। যে ম্যাজিকই দেখান সবাই ধরে ফেলে। একমাত্র আমিই ধরতে পারি না। তিনি যা দেখান তাতেই আমি মুগ্ধ হই। আপনার সমস্যা সমাধানের পদ্ধতিও হয়ত ম্যাজিকের মত। সেই ম্যাজিক দেখে মুগ্ধ হতে ইচ্ছা করে। আচ্ছা এই এতগুলি পাতা যে পড়লেন এরমধ্যে আমি খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা ইনফরমেশন দিয়ে দিয়েছি। বলুন তো ইনফরমেশনটা কি ? যদি বলতে পারেন তা হলে বুঝব আপনার সত্যি বুদ্ধি আছে। বলতে না পারলে তেত্রিশ পৃষ্ঠায় দেখুন।

মিসির আলি পড়া বন্ধ করলেন। তেত্রিশ পৃষ্ঠা না দেখে মেয়েটির সম্পর্কে বিশেষ কি বলা হয়েছে বের করার চেষ্টা করলেন। যা বলা হয়েছে তার বাইরে কি কিছু আছে? হ্যাঁ আছে, মেয়েটা তার আসল নাম বলেছে। তার আসল নাম ফারজানা। ফানিম্যান ছড়াটির প্রতি লাইনের প্রথম অক্ষর নিলে ফারজানা নামটা পাওয়া যায়। এমন জটিল কোনও ধাঁধা না। এছাড়া আর কিছু কি আছে ? আরেকবার পড়তে হবে। তবে যা পড়েছেন তাতে মেয়েটিকে খুঁজে বের করে ফেলার মত তথ্য আছে। ফারজানা মেয়েটি বোধ হয় তা জানে না। যেমন মেয়েটির বাবার নামে একটি হত্যা মামলা হয়েছিল। সেই মামলা ডিসমিস হয়ে যায়। আদালতের নথিপত্র ঘাটলেই বের হয়ে পড়বে। ডেড বডির পোস্টমর্টেম হয়েছিল। হাসপাতাল থেকেও সেই সম্পর্কিত কাগজ পত্র পাওয়া যাবে। একটু সময় সাপেক্ষ, তবে সহজ।

সেই সময়কার পুরানো কাগজ ঘাটলেও অনেক খবর পাওয়া যাওয়ার কথা। ‘পাষন্ড স্বামীর হাতে স্ত্রী খুন’ জাতীয় খবর পাঠক–পাঠিকারা খুব মজা করে পাঠ করেন। পত্রিকাওয়ালারা গুরুত্বের সঙ্গে সেই সব খবর ছাপেন। প্রথম পাতাতেই ছবি সহ খবর আসার কথা। তারপরের কয়েকদিন খবরের ফলো আপ।

অবশ্যি বাংলাদেশে পুরানো কাগজ ঘাটা খুব সহজ ব্যাপার নয়। যে ক’বার তিনি পুরানো কাগজ ঘাটতে গেছেন সে ক’বারই তাঁর মাথা খারাপ হবার জোগাড় হয়েছে। বিদেশের মত ব্যবস্থা থাকলে ভাল হত। সব কিছু কম্পিউটারে ঢুকান, বোতাম টিপে বের করে নেয়া।

মিসির আলি তার খাতা বের করলেন। কেইস নাম্বার দিয়ে ফারজানার নামে একটা ফাইল খোলা যেতে পারে। খাতার পাতায় ফারজানা নাম লিখতে গিয়ে মিসির আলি ইতস্তত করতে লাগলেন। ফাইল খোলার দরকার আছে কি ? এখনও বোঝা যাচ্ছে না, ফারজানার লেখা সব ক’টা পাতা না পড়লে বোঝা যাবেও না। মিসির আলি পেনসিলে গোটা গোটা করে লিখলেন,

নাম ঃ ফারজানা।

বয়স ঃ ২৩

==========================================

রোগ ঃ স্কিজোফ্রেনিয়া ???

স্কিজোফ্রেনিয়া লিখে তিনবার প্রশ্নবোধক চিহ্ন দিলেন। ফারজানার লেখা যে ক'টি পাতা এখন পর্যন্ত পড়েছেন তা তিনি আরও তিনবার পড়বেন। তারপর ঠিক করবেন প্রশ্নবোধক চিহ্ন গুলি রাখবেন, কি রাখবেন না। সে যা লিখেছে তা সত্যি কি না তাও দেখার ব্যাপার আছে। সত্যি কথা না লিখলে তথ্যে ভুল থাকবে। প্রথম পাঠে তা ধরা পড়বে না। যত বেশি বার পড়া হবে ততই ধরা পড়তে থাকবে। তার নিজের নামটা সে যেমন কায়দা করে ঢুকিয়ে দিয়েছে তার থেকে মনে হয় আরও অনেক নাম লেখার ভেতর লুকিয়ে আছে। সে গুলিও খুঁজে বের করতে হবে। তার মায়ের নাম কি চাঁপা? প্রিয় রঙ বলছে চাঁপা। আবার প্রিয় দুটি জিনিস চাঁদ এবং পানির প্রথম অক্ষর নিলেও চাঁপা হচ্ছে। এটা কাকতলীয়ও হতে পারে। যদি কাকতলীয় না হয় তা হলে মেয়েটি তার সঙ্গে রহস্য করছে কেন? এই রহস্য করার জন্য তাকে প্রচুর সময় দিতে হয়েছে। চিন্তা ভাবনা করতে হয়েছে। এটা সে কেন করছে? ব্যাপারটা ছেলেমানুষী তো বটেই। ফাইভ সিক্সে পড়ুয়া ছেলেমেয়েরা এইসব করতে পারে। ২৩ বছরের একটা মেয়ে তুচ্ছ ধাধা তৈরি করার জন্য সময় নষ্ট করবে কেন? ব্যাপার কি এমন যে মেয়েটার কিছু করার নেই। দিনের পর দিন যারা বিছানায় শুয়ে থাকে তারা ক্রসওয়ার্ড পাজল, বা ব্রেইন টিজলার জাতীয় খেলায় আনন্দ পেতে পারে। এমন কি হতে পারে যে মেয়েটিকে দিনের পর দিন শুয়ে থাকতে হচ্ছে। চিৎ হয়ে শুয়ে শুয়ে হাতে পাতার পর পাতা লেখা কষ্টকর। সে লিখেছে ১০০ পৃষ্ঠা, লিখতে তার সময় লেগেছে ২ বছর। একটা পৃষ্ঠা লিখতে তার গড় পড়তা সময় লেগেছে সাতদিনের কিছু বেশি। লেখাগুলি লেখা হয়েছে কালির কলমে। চিৎ হয়ে শুয়ে কালির কলমে লেখা যায় না। তাকে লিখতে হয়েছে উপুর হয়ে। উপুর হয়ে যে লিখতে পারে সে বিছানায় পড়ে থাকার মত অসুস্থ না। কাজেই সে শয্যাশায়ী একজন রোগী এই হাইপোথিসিস বাতিল।

মিসির তার খাতায় গুটি গুটি করে লিখলেন— ফারজানা মেয়েটি শারীরিক ভাবে সুস্থ।

তিনি আরেকটি কাজও করলেন— ফারজানার একশ পৃষ্ঠার কোন অংশগুলি দিনে লেখা হয়েছে— কোনও অংশগুলি রাতে লেখা হয়েছে— তা হলুদ মার্কার দিয়ে আলাদা করলেন। কাজটা জটিল মনে হলেও আসলে সহজ। রাতে আলো কমে যায় বলে রাতের লেখায় অক্ষরগুলি সামান্য বড় হয়। এবং লেখা স্পষ্ট করার জন্যে কলমে চাপ দিয়ে লেখা হয়। দিনের লেখা এবং রাতের লেখা আলাদা করার তেমন

==========================================

কোনও কারণ নেই। তারপরেও করে রাখা— হঠাৎ যদি এর ভেতর থেকে কিছু বের হয়ে আসে। খড়ের গাদায় হারিয়ে যাওয়া সুঁচও পাওয়া যায় যদি ধৈর্য ধরে প্রতিটি খড়— একটি একটি করে আলাদা করা হয়। মিসির আলি তাঁর অনুসন্ধানে ইনটিউশন যত না ব্যবহার করেন— পরিশ্রম তার চে অনেক বেশি ব্যবহার করেন।

==========================================



---

ছোট মা'কে আমি দেখতে শুরু করলাম। প্রথম প্রথম দু'দিন, তিন দিন পর পর হঠাৎ কিছুক্ষণের জন্যে দেখা যেত। তারপর রোজ-ই দেখতে পেতাম।।

শুরুতে তিনি আমার সঙ্গে কোনও কথা বলতেন না। আমি কিছু জিজ্ঞেস করলে চুপচাপ শুনতেন। তারপর কথা বলা শুরু করলেন। কথা বলতেন ফিস ফিস করে। কোথাও কোনও শব্দ হলে দারুণ চমকে উঠতেন।

হয়ত বাতাসে দরজা নড়ে উঠল— সেই শব্দে মা লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। ছুটে চলে গেলেন পর্দার আড়ালে। ছোট মা'র দেখা পাওয়াটা ঠিক স্বাভাবিক ব্যাপার না এটা আমার বোধের ভেতর ছিল। আমি এর বাইরেও কিছু কিছু ব্যাপার লক্ষ করলাম। যেমন ছোট মা কখনও কিছু খান না। আমি কমলা সেধেছি। প্লেট থেকে কেক তুলে দিয়েছি। তিনি কখনও কিছু মুখে দেন নি। তিনি যখন আশে পাশে থাকতেন তখন আমি এক ধরনের গন্ধ পেতাম। মিষ্টি গন্ধ, তবে ফুলের গন্ধ না। ওষুধ ওষুধ গন্ধ।

আসল ছোট মা'র সঙ্গে এই মায়ের কিছু অমিলও ছিল। যেমন ছোট মা আমাকে অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত নামে ডাকতেন। ইনি ডাকতেন না। একদিন আমি নিজেই বললাম, তুমি ঐ নামগুলি বল না। তিনি বিস্মিত হয়ে বললেন, কোন নাম? তা থেকে বুঝলাম নামগুলি তিনি জানেন না।

ছোটরাও নিজেদের মত করে কিছু পরীক্ষা-টরীক্ষা করে। আমিও ছোট মা'কে নিয়ে কিছু পরীক্ষা করলাম—যেমন একদিন জিজ্ঞেস করলাম, তোমার নাম কি?

ছোট মা বললেন, জানি না তো।

আমি বললাম, সত্যি জান না?

তিনি বললেন, না। আমার কি নাম?

আমি বললাম, তোমার নাম চাঁপা।

তিনি খুবই অবাক হয়ে বললেন, তাই নাকি? আমার সামান্য খটকা লাগলেও আমি নির্বিকার ছিলাম। একজন খেলার সাথি পেয়েছি, এই আমার জন্যে যথেষ্ট ছিল।

ছোট মা খেলার সঙ্গী হিসেবে চমৎকার ছিলেন। যা বলা হত তাই রোবটের মত করতেন। কোন প্রশ্ন করতেন না। মা'দের ভেতর খবরদারির একটা ব্যাপার থাকে। ওনার ভেতর তা ছিল না।

পায়ে মোজা নেই কেন?

ঘর নোংরা করছ কেন?

ঘুমুতে যাচ্ছ না কেন?

এ জাতীয় প্রশ্ন করে তিনি আমাকে কখনও বিব্রত করতেন না। আমার বেশ ক'জন টিচার ছিলেন। পড়ার টিচার, গানের টিচার, নাচের টিচার। তাঁরা যখন আসতেন— নীচ থেকে ইন্টারকমে আমাকে বলা হত। আমি নীচে যাবার জন্যে তৈরি হতাম। মা'কে সেই সময় খুব বিব্রত মনে হত। তিনি যেন ঠিক বুঝতে পারছেন না কি করবেন। তাঁকে খুব কাঁদতেও দেখতাম। দু'হাতে মুখ ঢেকে খুন খুন করে কাঁদতেন। চোখ দিয়ে তখন অবশ্যি পানি পড়ত না। তাঁর কান্না সব সময় ছিল অশ্রুবিহীন।

মিসির আলি সাহেব আপনি আমার সামনে নেই বলে আপনার নিশ্চয়ই অসুবিধা হচ্ছে। হয়ত আপনার মনে অনেক প্রশ্ন উঠে আসছে, কিন্তু আপনি প্রশ্নগুলি করতে পারছেন না। সামনা সামনি থাকলে প্রশ্ন করতে পারতেন। আর আমি নিজেও ঠিক বুঝতে পারছি না— কোনও ডিটেল বাদ পড়ে যাচ্ছে কি না। গুরুত্বহীন মনে করে আমি হয়ত অনেক কিছু লিখছি না—যা আপনার কাছে মোটেই গুরুত্বহীন না। তবু আপনার মনে সম্ভাব্য যে সব প্রশ্ন আসছে বলে আমার ধারণা—আমি তার জবাব দিচ্ছি।

প্রশ্ন ঃ ওনার গায়ে কি পোষাক থাকত?

উত্তর ঃ সাধারণ পোষাক। শাড়ি। যে সব শাড়ি আগে পরতেন সেই সব শাড়ি।

প্রশ্ন ঃ উনি কি হঠাৎ উপস্থিত হতেন এবং পরে বাতাসে মিলিয়ে যেতেন?

উত্তর ঃ না। কখনও হঠাৎ উদয় হতেন না। দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকতেন। বের হয়ে যাবার সময়ও দরজা খুলে বের হয়ে যেতেন। তাঁর পুরো ব্যাপারটাই খুব স্বাভাবিক ছিল। তাঁকে আমি কখনও শূন্যে ভাসতে দেখিনি— কিংবা লম্বা একটা

হাত বের করে দূর থেকে কিছু আনতে দেখিনি।

প্রশ্ন ঃ তুমি নিশ্চিত যে উনি তোমার ছোট মা?

উত্তর ঃ জ্বি নিশ্চিত। তবে আগেই তো বলেছি—আমার চেনা ছোটমা'র সঙ্গে তাঁর কিছু অমিল ছিল—যেমন তিনি পড়তে পারতেন না। অথচ ছোট মা আমাকে রোজ রাতে গল্পের বই পড়ে শুনাতেন। কাজেই আমি একদিন উনাকে গল্পের বই পড়ে শুনাতে বললাম। তিনি লজ্জিত গলায় বললেন যে তিনি বই পড়তে জানেন না। তিনি আমাকে বই পড়া শেখাতে বললেন।

প্রশ্ন ঃ তুমি তাঁকে বই পড়া শেখালে?

উত্তর ঃ জ্বি। উনি খুব দ্রুত শিখে গেলেন।

প্রশ্ন ঃ উনি কি তোমার জন্যে কখনও কোনও উপহার নিয়ে এসেছেন?

উত্তর ঃ জ্বি এনেছেন।

প্রশ্ন ঃ কি উপহার?

উত্তর ঃ সেটা আমি আপনাকে বলব না।

প্রশ্ন ঃ তুমি ছাড়া আর কেউ কি ওনাকে দেখেছে?

উত্তর ঃ জ্বি না।

প্রশ্ন ঃ তাঁকে দিনে বেশি দেখা যেত, না রাতে?

উত্তর ঃ দিন রাত কোন ব্যাপার ছিল না।

প্রশ্ন ঃ সব সময়ই কি একই কাপড় পরা থাকতেন?

উত্তর ঃ জ্বি না। একেক সময় একেক কাপড় পরা থাকত।

প্রশ্ন ঃ তিনি তোমার গায়ে হাত দিয়ে আদর করতেন?

উত্তর ঃ জ্বি করতেন। । মাঝে মাঝে আমি তাঁর কোলে উঠে বসে থাকতাম।

যে সব প্রশ্ন আমার মাথায় এসেছে তার উত্তর দিলাম। অনেক চিন্তা করেও আর কোন প্রশ্ন পাচ্ছি না। আপনারা যারা সাইকিয়াট্রিস্ট তাঁরা তো রাজ্যের প্রশ্ন করেন। উদ্ভট সব প্রশ্ন। আপনার মাথাতেও নিশ্চয়ই উদ্ভট সব প্রশ্ন আসছে। ও না ভুল করলাম— আপনি তো আবার অন্যদের মত না। আপনি প্রশ্ন করেন না। শুধু শুনে যান। একই গল্প বার বার শোনেন। শুনতে শুনতে হঠাৎ এক জায়গায় খটকা লাগে। যেখান থেকে আপনার যাত্রা শুরু হয়। আমার গল্পে কোথাও কি কোনও খটকা লেগেছে? নাকি পুরো গল্পই 'খটকাময়'? পুরো গল্প খটকাময় হলে তো আপনি কাগজগুলি ছুঁড়ে ফেলে বলবেন— আরে দূর দূর।

প্লীজ তা করবেন না। আমার অনেক কিছু বলার আছে। Please Help Me.

==========================================

আপনি নিশ্চয়ই এখন বিরক্তিতে ভুরু কুঁচকাচ্ছেন। ভাবছেন মেয়েটার কি কনট্রাডিকশান—সাহায্য চাচ্ছে, আবার কোনও ঠিকানা দিচ্ছে না। যোগাযোগ করছে না। নিজের পরিচয়ও গোপন করছে। আসল নাম না বলে, বলছে নাম চিত্রা। তাহলে সাহায্যটা করা হবে কি ভাবে? আসলে আমি সাহায্য চাই না। কারণ আমি ভালই আছি। আমার বিচিত্র জীবন সম্পর্কে আমি আপনাকে বলব। আপনি শুনবেন। আমার সমস্যার সমাধান করবেন। তার উপর একটা বই লেখা হবে। সেই বই কিনে আমি পড়ব। আমার এতেই হবে। এর বেশি সাহায্যের আমার প্রয়োজন নেই।

আরেকটা কথা—আপনি আবার ভাবছেন না তো আমার এই গল্প বানোয়াট গল্প? আপনাকে বিভ্রান্ত করার জন্যে উদ্ভট একটা গল্প ফেঁদেছি? একবার আপনার মাথায় এই ব্যাপারটা ঢুকে গেলে আপনি মনযোগ দিয়ে আমার লেখা পড়বেন না। এমনও হতে পারে যে কাগজগুলি ডাস্টবিনে ফেলে দেবেন। আমার প্রধান দায়িত্ব আপনাকে বিশ্বাস করান— আমি যা বলছি ,সত্যি বলছি। আমার কাছে যা 'সত্যি' অন্যের কাছে হয়ত নয়। সত্য একেক জনের কাছে একেক রকম। Truth has many faces. তাই না?

আমি যে সত্যি বলছি সেটা কি করে প্রমাণ করব? আমি জানি না। আমি আপনার হৃদয়ের মহত্বের কাছে সমর্পন করছি এবং আশা করছি আমাকে বিশ্বাস করবেন। আজ এই পর্যন্তই লিখলাম। মাথা ধরেছে— এখন আর লিখতে পারছি না। আপনার ঠোঁটে কি এখন মৃদু একটা হাসির রেখা? সাইকিয়াট্রিস্টরা 'মাথা ধরেছে' বাক্যটা শুনলেই নড়ে চড়ে বসেন। তাদের ভাবটা হচ্ছে—"এইবার পাওয়া গেছে" মাথায় সমস্যা বলেই মাথা ধরা।

আমেরিকার একজন সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে গিয়েছিলাম। আমি যাইনি— আমার বাবা আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন। ভদ্রমহিলা কিছুক্ষণ কথা বলার পরই গম্ভীর গলায় বললেন, ইয়াং লেডি, তোমার কি প্রায়ই মাথা ধরে?

আমি বললাম—হ্যাঁ।

ভদ্রমহিলার ঠোঁটে আনন্দের হাসি দেখা গেল। ভাবটা হচ্ছে—I got you at last.

তারপর অসংখ্য প্রশ্ন, সবই মাথা ধরা নিয়ে।

কখন মাথা ধরে? রাতে বেশি, না দিনে?

মাথা ধরার সময় কি চোখ জ্বালা করে?

কান লাল হয়ে যায়?

মাথা ধরার তীব্রতা কেমন?

কতক্ষণ থাকে?

তখন কি পানির পিপাসা হয়?

আমি যখন বললাম, ম্যাডাম আমার মাথা ধরাটা খুবই স্বাভাবিক ধরনের। মাঝে মধ্যে মাথা ধরে—প্যারাসিটামল খাই, কিংবা গরম চা খাই। মাথা ধরা সেরে যায়। ভদ্রমহিলা তাতে খুব হতাশ হলেন।

আপনিও কি হতাশ হচ্ছেন?

এমনিতে আমি কিন্তু খুব স্বাভাবিক মানুষ। আমি আমার মৃতা মা'কে দেখতে পেতাম এই অস্বাভাবিকতাটা ছোটবেলায় ছিল—বেশি দিনের জন্যে কিন্তু না। খুব বেশি হলে সাত কিংবা আট মাস। হঠাৎ একদিন সব আগের মত হয়ে গেল। ছোট মা'র আসা বন্ধ হল। আমি কিছুদিন প্রবল হতাশায় কাটালাম। ছোটদের হতাশা তীব্র আকার ধারণ করতে পারে। তবে তার স্থায়িত্বও কম হয়। শিশুদের প্রবল শোক এবং প্রবল হতাশা কাটিয়ে ওঠার সহজাত ক্ষমতা থাকে। আমিও হতাশা কাটিয়ে উঠলাম। ধীরে ধীরে সব আগের মত হয়ে গেল। অবশ্যি ছোট মা আসা পুরোপুরি বন্ধ করলেন তাও না। তিন চার মাস পর পর হঠাৎ চলে আসতেন। আমি যখন বলতাম, এতদিন আসনি কেন? তিনি বলতেন— আসার পথ ভুলে যাই। মনে থাকে না। আমার জীবন যাপন স্বাভাবিক হলেও আমি বড় হচ্ছিলাম নিঃসঙ্গতায়। আমার চারপাশে কেউ ছিল না। আমার নিঃসঙ্গতা দূর করলেন— নীতু আন্টি। তিনি আমাদের বাড়িতে থাকতে এলেন। আরও পরিষ্কার করে বলি— বাবা তাঁকে বিয়ে করলেন। আচ্ছা আপনি কি বাবার উপর বিরক্ত হচ্ছেন? কেমন মানুষ, একের পর এক বিয়ে করে যাচ্ছে। দয়া করে বিরক্ত হবেন না। আমার বাবা অসাধারণ একজন মানুষ।

এই যা মাথা ধরা নিয়ে অনেকক্ষণ লিখে ফেললাম। আচ্ছা আপনার কি এখন মাথা ধরেছে? কেন জিজ্ঞেস করলাম জানেন। ধরুন আপনি একজনের সঙ্গে কথা বলছেন। যার সঙ্গে কথা বলছেন তার প্রচন্ড মাথায় যন্ত্রণা। কিছুক্ষণ কথা বলার পরই দেখবেন আপনারও মাথা ধরেছে। কোনও কারণ ছাড়াই ধরেছে। এটা বহুল পরীক্ষিত একটা ব্যাপার। আমি অনেকবার পরীক্ষা করে দেখেছি। আপনিও করে দেখতে পারেন। এবার আপনাকে একটা ধাঁধা জিজ্ঞেস করছি। বলুন তো কোন প্রাণীর দু'টা লেজ? খুব সহজ! একটু চিন্তা করলেই পেয়ে যাবেন।

মিসির আলি পড়া বন্ধ করলেন। তিনি অনেক ভেবেও বের করতে পারলেন না— কোন প্রাণীর দু'টা লেজ। একবার টিকটিকির কথা মনে হয়েছিল। টিকটিকির একটা লেজ খসে গেলে আরেকটা গজায় সেই অর্থে টিকটিকিকে দুই লেজের প্রাণী

==========================================

কি বলা যায়? না— টিকটিকি হবে না।

উত্তরও কোথাও দেয়া নেই। মেয়েটির সঙ্গে দেখা হলেই উত্তরটা জানা যাবে। দেখা হবার সম্ভাবনা কতটুকু? এখনও তেমন কোনও সম্ভাবনা তিনি দেখছেন না। কারণ মেয়েটিকে খুঁজে বের করার কোনও চেষ্টা তিনি করছেন না। বয়সের কারণে তাঁর ভেতর এক ধরনের আলস্য কাজ করা শুরু করেছে। আশে পাশের জগৎ সম্পর্কে উৎসাহ কমে যাচ্ছে। লক্ষণ খুব খারাপ।

আত্মার মৃত্যু হলেই এ জাতীয় ঘটনা ঘটে। কোনও কিছুই মনকে আকৃষ্ট করে না। আত্মার মৃত্যু হয়েছে কি হয়নি তা বের করার একটা সহজ পদ্ধতির কথা তিনি জানেন। বৃষ্টি কেটে যাবার পর আকাশে যখন রঙধনু ওঠে সেই রঙধনুর দিকে তাকিয়ে যে চোখ নামিয়ে নেয় এবং দ্বিতীয়বার তাকায় না, তার আত্মার মৃত্যু হয়েছে। আকাশে রঙধনু না উঠলে তিনি তার আত্মার মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারছেন না।

মৃত আত্মাকে জীবনদান করারও কিছু পদ্ধতি আছে। সবচে সহজ পদ্ধতি হচ্ছে শিশুদের সঙ্গে মেশা। শিশুরা সব সময় তাদের আশেপাশের মানুষদের তাদের আত্মা থেকে খানিকটা ধার দেয়।

সমস্যা হচ্ছে শিশুদের মিসির আলি তেমন পছন্দ করেন না। এদের কাছ থেকে দূরে দূরে থাকতেই তাঁর ভাল লাগে। শিশুরা সুন্দর— অসম্ভব সুন্দর। যে কোনও বড় সৌন্দর্যকে দেখতে হয় দূর থেকে। যত দূর থেকে দেখা যায় ততই ভাল। "কুৎসিত জিনিস দেখতে হয় কাছ থেকে, সুন্দর জিনিস দূর থেকে।" এটা যেন কার কথা? মিসির আলি মনে করতে পারলেন না। তাঁর স্মৃতি শক্তি কি দুর্বল হতে শুরু করেছে?

ক্লান্ত পরিশ্রান্ত মস্তিষ্ক তার মেমোরী সেলে জমিয়ে রাখা স্মৃতি ফেলে দিয়ে সেলগুলি খালি করছে। মৃত্যুর ঠিক আগে আগে মেমোরী সেলে কোন মেমোরী থাকে না। মস্তিষ্ক সব ফেলে দিয়ে ঘর খালি করে দেয়।

মিসির আলি ঘুমুতে গেলেন রাত দশটায়। ইদানীং তিনি খুব নিয়ম কানুন মেনে চলার চেষ্টা করছেন। যেমন রাত দশটা বাজতেই ঘুমুতে যাওয়া। সকালবেলা মর্নিং ওয়াক। ঘড়ি ধরে কাজ করার চেষ্টা। রাত দশটায় ঘুমুতে গেলেও লাভ হচ্ছে না—ঘুম আসতে আসতে তিনটা বেজে যাচ্ছে। দশটা থেকে রাত তিনটা এই পাঁচ ঘন্টা মস্তিষ্ককে পুরোপুরি নিষ্ক্রিয় রাখা সম্ভব না। মিসির আলি সেই চেষ্টা করেনও না। তিনি শুয়ে শুয়ে ফারজানা মেয়েটিকে নিয়েই ভাবেন।

মেয়েটি স্কিজোফ্রেনিয়ার রোগী। সে তা জানে না। অধিকাংশ

==========================================

স্কিজোফ্রেনিয়াকই তা জানে না। তারা ভেবে নেয়— তাদের দেখা জগৎই সত্যি জগৎ। অন্যদের জগৎ ভ্রান্তিময়। তাদের একটা যুক্তি অবশ্যই আছে। কালার ব্লাইন্ড একজন মানুষ সবুজ রঙ দেখতে পায় না। তার জগতে সবুজের অস্তিত্ব নেই। সে বলবে পৃথিবীতে সবুজ রঙ নেই। তার কাছে এটাই সত্যি। তার সেই জগৎ মিথ্যা নয়।

মিসির আলি জেগে আছেন— তাঁর মাথায় ফারজানা মেয়েটি নেই। তাঁর মাথায় ঘুরছে কোন প্রাণীর লেজের সংখ্যা দুই। তাঁর হঠাৎ মনে হল ফারজানা মেয়েটি ইচ্ছে করে তাঁর মাথায় এই ধাঁধাটি ঢুকিয়ে দিয়েছে। ধাঁধার উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত এটা মাথায় ঘুরপাক খেতে থাকবে। মেয়েটি এই ব্যাপার জানে। স্কিজোফ্রেনিয়াকরা খুব বুদ্ধিমান হয়ে থাকে। তারা নিজেরা বিভ্রান্তির জগতে বাস করে বলেই হয়ত অন্যদের বিভ্রান্তিতে ফেলে আনন্দ পায়। মিসির আলির মাথা দপ দপ করছে। রেলগাড়িতে চড়লে যেমন কিছুক্ষণ পর পর শব্দ হয়—তাঁর মাথার ভিতর ঠিক সে রকম খানিকক্ষণ পর পর প্রশ্ন উঠছে —

কোন প্রাণীর দু'টা লেজ ?

কোন প্রাণীর দু'টা লেজ ? ?



---

এখন বাজছে সকাল ১১টা। কিছুক্ষণ আগে আমি নাস্তা খেয়ে লিখতে বসেছি। সকালের চা এখনও খাওয়া হয়নি। চা দিয়ে গেছে। চায়ের কাপ থেকে ধোঁয়া উড়ছে। আমার চায়ের কাপের ধোঁয়া দেখতে খুব ভাল লাগে। মিসির আলি সাহেব আপনার কি চায়ের কাপের ধোঁয়া দেখতে ভাল লাগে? মানুষের ভাললাগাগুলি একরকম হয় না কেন বলুন তো? মানুষকে তো নানান ভাবে ভাগ করা হয়। তাদের ভাললাগা, মন্দলাগা নিয়ে তাদের ভাগ করা হয় না কেন? আপনারা সাইকিয়াট্রিস্টরা সে রকম ভাগ করতে পারেন না?

যেমন ধরুন যে সব মানুষ —

ক) চায়ের কাপের ধোঁয়া ভালবাসেন।

খ) বেলী ফুলের গন্ধ ভালবাসেন।

গ) চাঁপা রঙ ভালবাসেন

তাদের মানসিকতা এক ধরনের। (আমার মত।) তাদের চিন্তা ভাবনায় খুব মিল থাকবে।

আচ্ছা আপনি কি আমার জ্ঞানী টাইপ কথা শুনে বিরক্ত হচ্ছেন?

থাক আর বিরক্ত হতে হবে না এখন আমি মূল গল্পে ফিরে যাই। এখন যে চ্যাপ্টারটা বলব সেই চ্যাপ্টারের নাম— নীতু আন্টি।

আমি ঘুমুচ্ছিলাম— রাত দশটা টশটা হবে। আমার ঘরের দরজা খোলা। ছোট মানুষ তো কাজেই দরজা খোলা থাকত। যাতে রাতে-বিরাতে বাবা এসে আমাকে দেখে যেতে পারতেন। এই কাজটা বাবা করতেন— রাতে খুব কম করে হলেও দু'বার এসে দেখে যেতেন। তখন ঘুম ভেঙ্গে গেলেও আমি ঘুমিয়ে থাকার ভান করতাম। কারণ কি জানেন? কারণ হচ্ছে আমি যখন জেগে থাকতাম তখন বাবা আমাকে আদর করতেন না। ঘুমন্ত অবস্থাতেই শুধু আদর করতেন। মাথার চুলে বিলি কেটে

দিতেন। হাতের আঙুল নিয়ে খেলা করতেন। এমন কি মাঝে মাঝে ঘুম পাড়ানি গানও গাইতেন। যদিও আমি তখন বড় হয়ে গেছি। ঘুম পাড়ানি গান শোনার কাল শেষ হয়েছে। ঘুমন্ত মানুষকে গান শুনানো— খুব মজার ব্যাপার না? আমার বাবা আসলেই বেশ মজার মানুষ। ভালবাসার প্রকাশকে তিনি দুর্বলতা বলে ভাবেন। (আরেকটা ব্যাপারও হতে পারে, বাবা হয়ত আমাকে ভালবাসতেন না। ভালবাসার ভান করতেন। মানুষের চোখের দিকে তাকিয়ে ভান করা যায় না বলেই আমি যখন ঘুমুতাম তখন ভান করতেন।)

নীতু আন্টির মধ্যেও এই ব্যাপার ছিল। ভালবাসার প্রকাশকে তিনিও দুর্বলতা মনে করতেন। তাঁর প্রধান চেষ্টা ছিল কেউ যেন তাঁর দুর্বলতা ধরে না ফেলে। তিনি শুরু থেকেই আমাকে পছন্দ করতেন। কিন্তু তাঁর দুর্বলতা আমি যেন ধরতে না পারি এটা নিয়ে সব সময় অস্থির থাকতেন।

তাঁর সঙ্গে প্রথম দেখার গল্পটা শুনুন। আমি শুয়ে আছি। ঘুমুচ্ছি। হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গল। দেখি কে একজন আমার চুলে হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছেন। প্রথম ভাবলাম ছোট মা। তারপরই মনে হল, না ছোট মা না— ইনার গায়ের গন্ধ অন্যরকম। বেলী ফুলের গন্ধের মত গন্ধ। আমি চোখ মেললাম। তিনি হাত সরিয়ে নিয়ে শুকনো গলায় বললেন, ঘুম ভাঙ্গিয়ে ফেললাম?

আমি বিছানায় উঠে বসলাম। তিনি আমার পাশে বসতে বসতে বললেন, "শোন মেয়ে আমি এখন থেকে তোমাদের বাড়িতে থাকব। তোমার বাবার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছে।" আমি তাকিয়ে রইলাম। কিছু বললাম না। তিনি আগের মতই শুকনো গলায় বললেন, তুমি তো ইতিমধ্যে দু'জনকে মা ডেকে ফেলছ। আমাকে মা ডাকার দরকার নেই। আমাকে আন্টি ডাকতে পার। অসুবিধা নেই। আমার নাম নীতা। তুমি ইচ্ছে করলে নীতু আন্টিও ডাকতে পার।

জ্বি আচ্ছা।

ঘর এত নোংরা কেন? চারদিকে খেলনা। কাল সকালেই ঘর পরিষ্কার করবে।

জ্বি আচ্ছা।

শোবার ঘরে স্যান্ডেল কেন? স্যান্ডেল থাকবে শোবার ঘরের বাইরে। শোবার ঘরটা থাকবে ঝকঝকে তকতকে, একদানা বালিও সেখানে থাকবে না। বুঝতে পারছ?

জ্বি।

এখন থেকে শোবার আগে চুল বেঁধে শোবে। এতদিন তো চুল বাঁধার কেউ

==========================================

ছিল না। এখন থেকে আমি বেঁধে দেব। আরেকটা কথা শুনে রাখ— আমি কিন্তু আহ্লাদ পছন্দ করি না। আমার সাথে কখনো আহ্লাদী করবে না। না ডাকলে আমাকে এসে বিরক্ত করবে না। মনে থাকবে?

থাকবে।

বাহ্ তোমার চুল তো খুব সুন্দর। সিল্কি চুল।

এই বলে তিনি আমার মাথার চুল নিয়ে খেলা করতে লাগলেন। আমি তৎক্ষণাৎ বুঝে ফেললাম—ইনি—চমৎকার একজন মহিলা। ইনার সঙ্গে সব রকম আহ্লাদ করা যাবে। এবং আহ্লাদ করলেও তিনি রাগ করবেন না। আমি আরও বুঝলাম এই মহিলার ভেতরও অনেক ধরনের আহ্লাদীপনা আছে।

নীতু আন্টি খুব সুন্দর ছিলেন। তাঁর মুখ ছিল গোলাকার। চোখ বড় বড়। তবে বেশির ভাগ সময়ই চোখ ছোট করে ভুরু কুঁচকে তাকাতেন। ভাবটা এরকম যে তিনি খুব বিরক্ত হচ্ছেন।

তিনি বাড়িতে এসেই বাড়ির কিছু নিয়মকানুন পাল্টে দিলেন— যেমন আগে একতলা থেকে কাজের মানুষরা কেউ দোতলায় আসতে পারত না। এখন থেকে পারবে। শুধু যে পারবে তাই না— একটা কাজের মেয়ে রাখা হল, যার একমাত্র কাজ আমার ঘর সাজিয়ে গুছিয়ে রাখা এবং রাতে আমার ঘরেই ঘুমান। তার জন্যে একটা ক্যাম্প খাটের ব্যবস্থা করা হল। সে ঘুমুতে যাবার আগে আগে আমার শোবার ঘরে সেই ক্যাম্প খাট পাতা হত। কাজের মেয়েটার নাম শরিফা। পনের ষোল বছর বয়স। ভারী শরীর। দেখতে খুব মায়া কাড়া। তার ছিল কথা বলা রোগ। অন্যদের সামনে সে চুপ করে থাকত। রাতে ঘুমুতে যাবার সময় যখন আমি ছাড়া আর কেউ থাকত না তখন সে শুরু করত গল্প। ভয়ংকর সব গল্প সে অবলীলায় বলত। গল্প শেষ করে সে নির্বিকার ভঙ্গিতে ঘুমুতে যেত। বাকি রাতটা আমার ঘুম হত না।

ভয়ংকর গল্পগুলি কি আপনি নিশ্চয়ই জানতে চাচ্ছেন। আপনার ধারণা ভয়ংকর গল্প মানে ভূত প্রেতের গল্প। আসলে তা না। ভয়ংকর গল্প মানে নারী-পুরুষের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের গল্প। আমার কাছে ভয়ংকর লাগত কারণ এই ব্যাপারটা অস্পষ্ট ভাবে জানতাম। আমার কাছে তা নোংরা, অরুচিকর এবং কুৎসিত মনে হত। আমি শরিফার গল্পের একটা নমুনা দিচ্ছি। আপনি আমার মানসিক অবস্থা ধরার চেষ্টা করছেন বলেই দিচ্ছি। অন্য কাউকে এ ধরনের গল্প আমি কখনও বলব না। আমার পক্ষে বলা সম্ভব না। শরিফার যে গল্পটি আমি বলছি তা হচ্ছে তার কাছ থেকে শোনা সবচে ভদ্র গল্প। আমি শরিফার ভাষাতেই বলার চেষ্টা করি।

"বুঝছেন আফা—আমরা তো গরীব মানুষ—আমরার গেরামের বাড়িত টাট্টিখানা নাই। টাট্টিখানা বুঝেন আফা? পাইখানারে আমরা কই টাট্টিখানা। উজান দেশে কয় টাট্টি ঘর। তখন সইন্ধা রাইত—আমার ধরছে 'পেসাব'। বাড়ির পিছনে রওনা হইছি হঠাৎ কে জানি আমার মুখ চাইপ্যা ধরছে। চিক্কুর দিমু হেই উপায় নাই। আন্ধাইরে পরিষ্কার কিছু দেখা যায় না। খালি বুজতাছি দুইটা গুন্ডা কিসিমের লোক আমারে টাইন্যা লইয়া যাইতাছে। আমি ছাড়া পাওনের জন্যে হাত পাও মুচড়াইতাছি। কোনও লাভ নাই। এরা আমারে নিয়া গেল ইস্কুল ঘরে। এরার মতলবটা তো আফা আমি বুঝতে পারতাছি। আমার কইলজা গেছে শুকাইয়া। এক মনে দোয়া ইউনুস পড়তাছি। এর মধ্যে ওরা আমারে শুয়াইয়া ফেলছে। একজনে টান দিয়া শাড়ি খুইল্যা ফেলছে ..................

গল্পের বাকি অংশ আমার পক্ষে বলা সম্ভব না। আপনি অনুমান করে নিন। এ জাতীয় গল্প রোজ রাতে আমি শুনতাম। আমার শরীর ঝিম ঝিম করত। সম্পূর্ণ নতুন ধরনের অনুভূতি। যার সঙ্গে আমি পরিচিত না। তখন আমার বয়স — মাত্র তের।

মিসির আলি সাহেব শরিফার গল্প শোনার জন্যে আমি অপেক্ষা করতাম। 'ভয়ংকর' ভাল লাগত। আপনি লক্ষ্য করুন আমি ভাল শব্দের আগে 'ভয়ংকর' বিশেষণ ব্যবহার করেছি।

নীতু আন্টিও আমাকে গল্প বলতেন। সুন্দর সুন্দর সব গল্প। তাঁর কিশোরী বয়সের সব গল্প। একান্নবর্তি পরিবারে মানুষ হয়েছেন। চাচাত বোন ভাই সব মিলিয়ে বাড়িতে অনেকগুলি মানুষ। সারাদিন কোথাও না কোথাও মজার কিছু হচ্ছে। নীতু আন্টির এক বোন আবার প্লানচেট করা জানত। সে রোজই আত্মা নিয়ে আসত। বিখ্যাত ব্যক্তিদের আত্মা— রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, শেকসপীয়ার, আইনস্টাইন, এদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ আসতেন খুব ঘন ঘন। প্লানচেট করলেই তিনি চলে আসতেন। দু'লাইন, চার লাইনের কবিতা লিখে যেতেন। সে সব কবিতা খুব উচ্চমানের হত না। কে জানে কবিরা হয়ত মৃত্যুর পর তাদের কাব্য শক্তি হারিয়ে ফেলেন। ওনার লেখা একটা কবিতার নমুনা—

"আকাশে মেঘমালা
বাতাসে মধু
নীতু নব সাজে সেজে
নবীনা বধু।"

একবার নীতু আন্টির বিয়ের কথা হচ্ছিল তখন রবীন্দ্রনাথ প্লানচেটে এই

কবিতা লিখে যান। সেই বিয়ে অবশ্য হয়নি।

আমি নীতু আন্টিকে খুব করে ধরলাম আমাকে প্লানচেট শিখিয়ে দিতে। তিনি শিখিয়ে দিলেন। খুব সহজ, একটা কাগজে এ বি সি ডি লেখা থাকে। একটা বোতামে আঙ্গুল রেখে বসতে হয়। মুখোমুখি দু জন বসতে হয়। মুখে বলতে হয়- If any good soul passes by, please come. তখন মৃত আত্মা চলে আসেন এবং বোতামে আশ্রয় নেন। এবং বোতাম নড়তে শুরু করে। আত্মাকে প্রশ্ন করলে অদ্ভুত ভঙ্গিতে সেই প্রশ্নের জবাব আসে। এক অক্ষর থেকে আরেক অক্ষরে গিয়ে পুরো বাক্য তৈরি হয়। এ বি সি ডি না লিখে অ, আ, লিখেও হয়। তবে A B C D লেখাই সহজ।

নীতু আন্টির কাছ থেকে শিখে আমি খুব আত্মা আনা শুরু করলাম। বেশির ভাগ সময়ই রবীন্দ্রনাথ আসেন। মনে হয় তাঁর অবসরই সবচেয়ে বেশি।

এক রাতে ছোট মা চলে এলেন। সে রাতে বাসায় কেউ ছিল না। বাবা এবং নীতু আন্টি গিয়েছেন বিয়েতে। ফিরতে রাত হবে। শরিফা গিয়েছে দেশের বাড়িতে। তার মামা এসে তাকে নিয়ে গেছে। তার বিয়ের কথা হচ্ছে। বিয়ে হয়ে গেলে সে আর ফিরবে না। একা একা প্লানচেট নিয়ে বসেছি। বোতামে আঙ্গুল রাখতেই বোতাম নড়তে শুরু করল। আমি বললাম, আপনি কি এসেছেন?

বোতাম চলে গেল "Yes" লেখা ঘরে। অর্থাৎ তিনি এসেছেন।

আমি বললাম, আপনি কে ?

বোতাম চলে গেল "R" অক্ষরে। অর্থাৎ যিনি এসেছেন তাঁর নামের প্রথম অক্ষর "R" খুব সম্ভবত রবীন্দ্রনাথ আবার এসেছেন। আমি বললাম, আপনার নামের শেষ অক্ষরও কি""R" ? বোতাম চলে গেল "Yes"এ। রবীন্দ্রনাথ যে এসেছেন তাতে আর সন্দেহ নেই। আমি বললাম আমার মত ছোট্ট একটা মেয়ের ডাকে যে আপনি এসেছেন তাতে আমি খুব খুশি হয়েছি। আপনাকে ধন্যবাদ। আপনি আমার অভিনন্দন গ্রহণ করুন। এই সব হচ্ছে গৎ বাঁধা কথা। মৃত আত্মাকে সম্মান দেখানোর জন্য এইসব বলতে হয়। তবে শুধু ভাল আত্মাদের বেলায় বলতে হয়। খারাপ আত্মাদের বেলায় কিছু বলতে হয় না। খারাপ আত্মাদের অতি দ্রুত বিদেয় করার ব্যবস্থা করতে হয়।

আমি ধন্যবাদ দেয়া শেষ করার পর পর এক কান্ড হল। দরজার পর্দা সরিয়ে ছোট মা ঘরে ঢুকলেন। অনেক অনেক দিন পর তাঁর দেখা পেলাম। আগে ছোট মা'কে দেখে কখনও ভয় পাইনি—সে রাতে হঠাৎ বুক ধক করে উঠল। ভয় পাবার প্রধান কারণ বাইরে ঝড় বৃষ্টি হচ্ছিল, আমার ভয় হচ্ছিল— এই বুঝি ইলেকট্রিসিটি চলে

যাবে। আমার ঘরে একটা চার্জার আছে। ইলেকট্রিসিটি চলে গেলে চার্জার জ্বলে ওঠার কথা। আমার ঘরের চার্জারটা নষ্ট। মাঝে মাঝে ইলেকট্রিসিটি চলে যায় কিন্তু চার্জার জ্বলে না। টেবিলের ড্রয়ারে অবশ্যি মোমবাতি আছে। দেয়াশলাই আছে কি না জানি না। মনে হয় নেই। ভয়ে আমার বুক ধক ধক করছে— আমি এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি ছোট মা'র দিকে। তিনি বললেন, ফারজানা কেমন আছ?

এইরে আমার আসল নাম বলে ফেললাম। যাই হোক আমার ধারণা— ইতিমধ্যে আপনি আমার নাম জেনে ফেলেছেন। ভাল কথা চিত্রাও কিন্তু আমার নাম। আমার আসল মা আমার নাম রেখেছিলেন চিত্রা। মা'র মৃত্যুর পর কেন জানি এই নামটা আর ডাকা হত না। আমার আরও দু'টা ডাক নাম আছে— বিবি, বাবা এই নামে আমাকে ডাকেন। আরেকটা হল —নিশি। বাবা ছাড়া বাকি সবাই আমাকে নিশি নামে ডাকে। বাকি ছাড়া সবাই বলতে আমি স্কুলের বন্ধুদের কথা বলছি।

যে কথা বলছিলাম, ছোট মা বললেন, ফারজানা কেমন আছ?

আমি বললাম, ভাল।

তুমি একা, তাই না?

আমি বললাম, হ্যাঁ।

অনেকদিন পর তোমাকে দেখতে এসেছি। তোমার স্বাস্থ্য ভাল হয়েছে। চুল খুব সুন্দর করে কেটেছ। কে কেটে দিয়েছে?

নীতু আন্টি।

তিনি তোমাকে খুব ভালবাসেন?

হুঁ।

তাঁকে কি তুমি আমার কথা বলেছ?

না।

খুব ভাল করেছ। শরিফাকে আমার কথা বলেছ?

না।

শরিফা মেয়েটা খুব খারাপ তুমি কি তা জান?

না।

মেয়েটা তোমাকে খারাপ করে দিচ্ছে তা কি বুঝতে পারছ? মেয়েটাকে তুমি পছন্দ কর। তাই না?

হ্যাঁ।

তুমি আমার দিকে এ ভাবে তাকাচ্ছ কেন? তুমি কি আমাকে ভয় পাচ্ছ?

হ্যাঁ।

ভয় পেও না।

আচ্ছা।

ভূত নামানোর খেলা কেন খেলছ? এইগুলি ভাল না। আর কখনও খেলবে না।

আচ্ছা।

নীতু আন্টিকে তুমি খুব পছন্দ কর?

হ্যাঁ।

তাকে আমার কথা কখনও বলবে না।

আচ্ছা।

আমি এখন চলে যাব।

আর আসবেন না?

আসব। শরিফাকে শাস্তি দেবার জন্য আসব। ওকে আমি কঠিন শাস্তি দেব।

একটা ব্যাপার আপনাকে বলি যে ছোট মা আমার কাছে আসতেন এই ছোট মা সে রকম নন। তাঁর চোখের দৃষ্টি কঠিন, গলার স্বর কঠিন। অথচ আগে যিনি আসতেন— তিনি ছিলেন আলা ভোলা ধরনের। তাঁর মধ্যে ছিল অস্বাভাবিক মমতা। তিনি এসেই আমার মাথায় হাত দিতেন— অথচ ইনি দূরে দাঁড়িয়ে রইলেন। একবারও মাথায় হাত দিলেন না বা কাছেও এলেন না।

নীচে গাড়ির শব্দ হল। ছোট মা পর্দা সরিয়ে বের হয়ে গেলেন। নীতু আন্টি তার কিছুক্ষণ পরই ঘরে ঢুকলেন। আমি জানি তিনি এখন কি করবেন—বিয়ে বাড়িতে মজার ঘটনা কি কি ঘটল তা বলবেন। বলতে বলতে হেসে ভেঙ্গে পড়বেন। যে সব ঘটনা বলতে বলতে তিনি হেসে গড়িয়ে পড়েন সাধারণত সে সব ঘটনা তেমন হাসির হয় না। তবু আমি তাঁকে খুশি করার জন্যে হাসি। আজ অন্যান্য দিনের মত হল না। ঘরে ঢুকেই তিনি ভুরু কুঁচকে ফেললেন— তাঁর হাসি হাসি মুখ হঠাৎ করে গম্ভীর হয়ে গেল। তিনি শীতল গলায় বললেন, এই মেয়ে কেউ কি এসেছিল?

আমি থতমত খেয়ে বললাম, না তো।

ঘরে বিশ্রী গন্ধ কেন?

বিশ্রী গন্ধ?

অবশ্যই বিশ্রী গন্ধ। মনে হচ্ছে নর্দমা থেকে কেউ উঠে এসে ঘরে হাঁটাহাটি করেছে।

আমি কথা ঘুরাবার জন্য বললাম, আন্টি বিয়ে বাড়িতে আজ কি হল?

আন্টি বললেন, তোমার ঘরে কোনও কোণায় ইঁদুর মরে নেই তো? মরা মরা

গন্ধ পাচ্ছি। তুমি পাচ্ছ না?

না।

দাঁড়াও। ঘর ঝাড় দেবার ব্যবস্থা করি।

নীতু আন্টি উপস্থিত থেকে ঘর ঝাঁট দেওয়ালেন। স্যাভলন পানি দিয়ে মেঝে মুছালেন—তারপরও তার নাকে মরা মরা গন্ধ লেগে রইল। তিনি বাবাকে ডেকে নিয়ে এসে বললেন, তুমি কি কোন গন্ধ পাচ্ছ?

বাবা বললেন, পাচ্ছি।

কিসের গন্ধ?

স্যাভলনের গন্ধ।

পচা-কটু কোনও গন্ধ পাচ্ছ না?

না তো।

আমি পাচ্ছি।

বাবা হাসতে হাসতে বললেন, তোমার সুপার সেনসেটিভ নাক তুমি তো পাবেই। আমাদের পূর্ব পুরুষ বানর ছিলেন। তোমার পূর্ব পুরুষ সম্ভবত কুকুর।

রসিকতা করবে না।

নীতু আন্টি চিন্তিতমুখে বের হয়ে গেলেন। রাতে আমার ঘরে ঘুমুতে এলেন। এটা নতুন কিছু না। তিনি প্রায়ই রাতে আমার ঘরে ঘুমুতেন। না, প্রায়ই বলাটা বোধ হয় ঠিক হচ্ছে না। সপ্তাহে একদিন বলাটা যুক্তিযুক্ত হবে। স্কুলের সাপ্তাহিক ছুটির আগের দিন তিনি গভীর রাত পর্যন্ত গুটুর গুটুর করে গল্প করতেন। আমার জন্য সেই রাতগুলি খুব আনন্দময় হত। শরিফার ভয়ংকর গল্পগুলি শুনতে পেতাম না, তার জন্যে অবশ্যি একটু খারাপ লাগত।

নীতু আন্টি আমার ঘরে ঘুমুতে এসেছেন আমার এত ভাল লাগল। আন্টি বললেন—আজ শরিফা নেই তো তাই তোমার সঙ্গে ঘুমুতে এসেছি। ঝড় বৃষ্টি হচ্ছে--একা ঘুমুতে ভয়ও পেতে পার। আজ কিন্তু গল্প হবে না। কাল তোমার স্কুল আছে। আমি বললাম, আন্টি খারাপ গন্ধটা কি এখনও পাচ্ছেন?

হ্যাঁ পাচ্ছি।

আন্টি বাতি নিভিয়ে আমাকে কাছে টেনে শুতে গেলেন। আমি হঠাৎ বললাম, আন্টি আপনাকে একটা কথা বলি— তিনি হাই তুলতে তুলতে বললেন, বল। লম্বা চওড়া কথা না তো? রাত জেগে গল্প শুনতে পারব না। আমার ঘুম পাচ্ছে।

আমি চাপা গলায় বললাম, আন্টি মৃত মানুষ কি আসতে পারে?

তার মানে?

না, কিছু না।

আন্টি বিছানায় উঠে বসলেন। হাত বের করে টেবিল ল্যাম্প জ্বালিয়ে বললেন, কি বলতে চাও ভাল করে বল। অর্ধেক কথা বলবে, অর্ধেক পেটে রাখবে তা হবে না।

আমি চুপ করে রইলাম। নীতু আন্টি কঠিন গলায় বললেন, উঠে বস।

আমি উঠে বসলাম।

এখন বল মৃত মানুষের আসার কথা আসছে কেন? তুমি কি কোনও মৃত মানুষকে আসতে দেখেছ?

হ্যাঁ।

সে কি আজ এসেছিল?

হ্যাঁ।

মৃত মানুষটা কি তোমার মা?

না, আমার ছোট মা।

পুরো ঘটনাটা আমাকে বল। কিছু বাদ দেবে না।

বলতে ইচ্ছা করছে না।

ইচ্ছে না করলেও বল। পুরো ব্যাপারটা আমাকে তুমি তোমার ভালোর জন্যে বলবে।

এটা বললে আমার ভাল হবে না।

তুমি বাচ্চা একটা মেয়ে—কিসে তোমার মঙ্গল, কিসে তোমার অমঙ্গল তা বোঝার ক্ষমতা তোমার হয়নি। বল ব্যাপারটা কি?

আরেক দিন বলব।

আরেক দিন না। আজই বলবে। এখনই বলবে।

আমি বলতে শুরু করলাম। কিছুই বাদ দিলাম না। নীতু আন্টি চুপ করে শুনে গেলেন। কথার মাঝখানে একবারও বললেন না— তুমি এসব কি বলছ!

গল্প বলা শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে আমি বুঝলাম— আমি কি বলছি না বলছি সবই ছোট মা শুনছেন। তিনি ঘরের ভেতর নেই— কিন্তু কাছেই আছেন। পর্দার ওপাশেই আছেন। পর্দার বাইরে দাঁড়িয়ে তিনি যে নিঃশ্বাস ফেলছেন আমি তাও শুনতে পাচ্ছিলাম। গল্প শেষ করার পর পর নীতু আন্টি বললেন, ঘুমিয়ে পড়। বলেই তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। আমি সারা রাত জেগে রইলাম। এক ফোঁটা ঘুম হল না। শুরু হল আমার রাত জাগার কাল।

ছোটদের উদ্ভট অস্বাভাবিক কথা বড়রা সব সময় হেসে উড়িয়ে দেন। সেটাই

স্বাভাবিক। ছোটদের উদ্ভট গল্প গুরুত্বের সঙ্গে কখনও গ্রহণ করা হয় না। গ্রহণ করা হয়ত ঠিকও নয়। আন্টি আমার গল্প কি ভাবে গ্রহণ করলেন কিছুদিন আমি তা বুঝতেই পারলাম না। ছোটি মা'র প্রসঙ্গ তিনি আমার সঙ্গে দ্বিতীয়বার তুললেন না। যেন কিছু শোনেন নি। পুরোপুরি স্বাভাবিক আচার আচরণ। শুধু রাতে আমার সঙ্গে ঘুমুতে আসেন। তখন অনেক গল্প টল্প হয় — ছোট মা'র প্রসঙ্গ কখনও আসে না।

আপনাকে তো আগেই বলেছি আমার ইনসমনিয়ার মত হয়ে গিয়েছিল। শেষ রাতের দিকে ঘুম আসত। রাত একটার দিকে বাড়ি পুরোপুরি নিঃশব্দ হয়ে যেত তখন বিচিত্র সব শব্দ শুনতে পেতাম। যেমন খাটের চারপাশে কে যেন হাঁটত। সে কে তা আমার কাছে পরিষ্কার না। ছোট মা হতে পারেন — অন্য কেউও হতে পারে। প্রচন্ড ভয়ে আমি অস্থির হয়ে থাকতাম। যেহেতু রাতে ঘুম আসত না — দিনটা কাটত ঝিমুনিতে। ক্লাসে বসে আছি, স্যার অংক করাচ্ছেন। আমার তন্দ্রার মত চলে এল। আধো ঘুম আধো জাগরণে চলে গেলাম। স্যারের দিকে তাকিয়ে থেকেই স্বপ্ন পর্যন্ত দেখতে শুরু করতাম। এই স্বপ্নগুলি খুব অদ্ভুত। অদ্ভুত এই কারণে যে আমি তন্দ্রায় যে সব স্বপ্ন দেখতাম তার প্রতিটি সত্য হয়েছে। আমি তন্দ্রায় যা দেখতাম তাই ঘটত। তারচেয়ে মজার ব্যাপার, স্বপ্নগুলিকে আমি ইচ্ছামত বদলাতে পারতাম। তবে আমি যে স্বপ্ন বদলাতেও পারি এটা বুঝতে সময় লেগেছিল। আগে বুঝতে পারলে খুব ভাল হত। আমি বোধ হয় ব্যাপারটা আপনাকে বুঝাতে পারছি না। উদাহরণ দিয়ে বুঝাই।

ধরুন আমি স্বপ্নে দেখলাম বাবা চেয়ারে বসে লিখছেন। তিনি বসেছেন সিলিং ফ্যানের নীচে, হঠাৎ সিলিং ফ্যানটা খুলে তাঁর মাথায় পড়ে গেল। রক্তে চারদিক ভেসে যাচ্ছে। আমার তন্দ্রা ভেঙ্গে গেল। আমার এই স্বপ্ন দেখা মানে—ব্যাপারটা ঘটবে। আমি তৎক্ষণাৎ ঠিক করলাম—না ব্যাপারটা এ রকম হবে না। স্বপ্নটা যে ভাবেই হোক বদলে দিতে হবে তখন নতুন স্বপ্নের কথা ভাবলাম। যেমন ধরুন আমি ভাবলাম— বাবা লেখার টেবিলে বসেছেন। কি মনে করে হঠাৎ সিলিং ফ্যানের দিকে তাকালেন। তারপর সরে দাঁড়ালেন— ওমনি ঝপাং শব্দ করে ফ্যান পড়ে গেল। বাবার কিছু হল না। পুরো ব্যাপারটা ভেবে রাখার পর—অবিকল যেমন ভেবে রেখেছি তেমনি স্বপ্ন দেখতাম। আপনি এটাকে কি বলবেন, কোনও ক্ষমতা?

না আপনি তা বলবেন না। মানুষের যে আধ্যাত্মিক ক্ষমতা থাকতে পারে এইসব আপনি বিশ্বাস করেন না। আপনার কাছে মানুষ যন্ত্রের মত। একটা ছেলে যদি একটা মেয়েকে ভালবাসে তাহলে আপনি ধরেই নেবেন— ব্যাপারটা আর কিছুই

না একজন আরেকজনের প্রতি শারীরিক আকর্ষণ বোধ করছে। শারীরিক আকর্ষণ যেহেতু নোংরা একটা ব্যাপার কাজেই ভালবাসা নামক মিষ্টি একটা শব্দ ব্যবহার করছে। কুইনাইনকে সুগার কোটেড করা হচ্ছে। আমি কি ভুল বললাম?

আমি ভুল বলিনি। আপনি যাই ভাবেন—কিন্তু শুনুন স্বপ্ন তৈরি করার ক্ষমতা আমার আছে। এবং আমি এখনও পারি। ঘটনা বলি। ঘটনা বললেই আপনি বুঝবেন।

শরিফা তো বাড়ি থেকে চলে গেল। ওর বিয়ে হবার কথা। বিয়ে হলে আর ফিরবে না। আমি একদিন স্বপ্ন দেখলাম ওর বিয়ে হচ্ছে। চেংড়া টাইপের ছেলে! পান খেয়ে দাঁত লাল করে আছে—আর ভ্যাক ভ্যাক করে হাসছে। স্বপ্ন দেখে খুব মেজাজ খারাপ হল। তখন ভাবলাম, বিয়ে হয়ে গেছে ঠিকই কিন্তু বরের সঙ্গে ওর খুব ঝগড়া হয়েছে, ও চলে এসেছে আমাদের বাড়িতে। যেরকম ভাবলাম অবিকল সেরকম স্বপ্ন দেখলাম। হলও তাই। এক সন্ধ্যাবেলা শরিফা উপস্থিত। তার বিয়ে হয়ে গেছে কিন্তু বর তাকে নিচ্ছে না। বিয়ের সময় কথা হয়েছিল বরকে একটা সাইকেল এবং নগদ পাঁচ হাজার এক টাকা দেয়া হবে। কোনওটাই দেয়া হয়নি বলে তারা কনে উঠিয়ে নেবে না। যেদিন সাইকেল এবং টাকা দেয়া হবে সেদিনই মেয়ে তুলে নেবে। আমি শরিফাকে বললাম, তোমার কি মন খারাপ?

শরিফা বলল, মন খারাপ কইরা লাভ আছে আফা?

তোমাকে যে তুলে নিচ্ছে না তোমার রাগ লাগছে না?

না। সাইকেল আর টেকা দিব বইল্যা দেয় নাই। তারার তো আফা কোনও দোষ নাই। একটা জিনিস দিবেন বলবেন, তারপরে দিবেন না— এইটা কেমন কথা?

তোমার বর পছন্দ হয়েছে?

হু।

তোমার সঙ্গে তোমার বরের কথা হয়েছে?

ওমা কথা আবার হয় নাই? এক রাইত তার লগে ছিলাম না?

রাতে তোমরা কি করলে?

কওন যাইব না আফা। বড়ই শরমের কথা। লোকটার কোনও লজ্জা নাই। এমন বেহায়া মানুষ জন্মে দেখি নাই। ছিঃ ছিঃ ছিঃ।

না বল আমি শুনব।

অসাম্ভাব কথা আফা। ছিঃ।

তুমি বলবে না?

জীবন থাকতে না।

আমি নিষিদ্ধ কথা শোনার জন্যে ছটফট করছিলাম। এবং আমি জানি

শরিফাও নিষিদ্ধ কথাগুলি বলার জন্যে ছটফট করছিল।

দেখলেন তো স্বপ্ন পাল্টে কি ভাবে শরিফাকে বাড়িতে নিয়ে এলাম? আপনি বলবেন, কাকতলীয়। মোটেই না। শরিফার বরকে আমার খুব দেখতে ইচ্ছে করল, কাজেই একদিন খুব ভাবলাম, শরিফার বর এসেছে। যেমন ভাবলাম, ঠিক সেরকম স্বপ্ন দেখলাম। শরিফার বর চলে এল। নীল রঙের একটা লুঙ্গি। রবারের জুতা। সিল্কের চক্রাবক্রা একটা শার্ট। এসেই বাসার সবাইকে পা ছুঁয়ে সালাম করে ফেলল। এমন কি আমাকেও। শরিফার বরের নাম— সিরাজ মিয়া। সে নারায়ণগঞ্জে একটা লেদ মেশিনের হেল্পার।

আন্টি তাকে খুব বকা দিলেন। কঠিন গলায় বললেন, তুমি পেয়েছ কি? যৌতুক পাও নি বলে বউ ঘরে নেবে না। তুমি কি জান পুলিশে খবর দিলে তোমার পাঁচ বছরের জেল হয়ে যাবে। বাংলাদেশে যৌতুক নিবারনী আইন পাশ হয়েছে। দেব পুলিশে খবর?

সিরাজ মিয়া বলল, ইচ্ছা হইলে দেন। আফনেরা বড় লোক। আফনেরা যা বলবেন সেইটাই ন্যায়।

আন্টি আরও রেগে গেলেন। তাঁর ভাব ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছিল এখনই তিনি ধানমন্ডি থানার ওসিকে খবর দেবেন। আমাকে বললেন, ফারজানা দাও তো টেলিফোনটা। ওসি সাহেবকে আসতে বলি।

আমি টেলিফোন এনে দিলাম। আমার একটু ভয় ভয় করছিল, কিন্তু সিরাজ মিয়া নির্বিকার। তাকে চা আর কেক খেতে দেয়া হয়েছে। সে চায়ে কেক ডুবিয়ে বেশ মজা করে খাচ্ছে।

আন্টি ধানমন্ডি থানার ওসিকে খবর দিলেন না। কাকে যেন টেলিফোন করে বললেন, একটা নতুন সাইকেল কিনে বাসায় নিয়ে আসতে।

সিরাজ মিয়া নির্লজ্জের মত বলল, আমারে টেকা দেন। আমি দেইখ্যা শুইন্যা কিনব। বাজারে নানান পদের সাইকেল— সব সাইকেল ভাল না।

আন্টি বললেন, তোমাকে দেখে শুনে কিছুই কিনতে হবে না। তুমি তোমার আত্মীয় স্বজনকে নিয়ে আস। আমি তোমাকে সাইকেল আর পাঁচ হাজার এক টাকা দিয়ে দেব। তুমি শরিফাকে নিয়ে যাবে। যদি শুনি এই মেয়ের উপর কোনও অত্যাচার হয়েছে আমি তোমার চামড়া খুলে ফেলব। গরুর চামড়া যে ভাবে খোলে ঠিক সেই ভাবে খোলা হবে।

সিরাজ মিয়া চা কেক খেয়ে হাসি মুখে চলে গেল। বলে গেল আগামী বুধবার সে তার বাবাকে নিয়ে আসবে। এবং সেদিনই বউ নিয়ে চলে যাবে।

=====================================

আন্টির এই ব্যাপারটা আমার কি যে ভাল লাগল। আনন্দে আমার চোখে প্রায় পানি এসে গেল। আর শরিফা যে কি খুশী হল। এক্কেবারে পাগলের মত আচরণ। এই হাসছে। এই কাঁদছে।

বুধবার সকালে শরিফাকে নিয়ে যাবে। আন্টি তার বরের জন্যে শুধু যে সাইকেল আনালেন তা না— একটা নতুন শার্ট কেনালেন। শরিফাকে দিলেন দু'টা শাড়ি— কানের দুল। শরিফা নিজেই দোকান থেকে রূপার নূপুর কিনে এনে পায়ে পরেছে। যখন হাঁটে ঝমঝম শব্দ হয়। খুব হাস্যকর ব্যাপার।

মঙ্গলবার আমাদের স্কুল ছুটি ছিল। বৌদ্ধ পূর্ণিমার ছুটি। আমি দুপুরে শুয়ে আছি— হঠাৎ স্বপ্নে দেখি—ছোট মা এসে আমাকে বলছেন, ফারজানা আমি বলেছিলাম না এই মেয়েটাকে শাস্তি দেব? ও চলে যাচ্ছে— যাবার আগে শাস্তি দিয়ে দেয়া দরকার তাই না?

আমি চুপ করে রইলাম। ছোট মা বললেন— কথা বলছ না কেন? কি ধরনের শাস্তি দেয়া যায় বল তো। তুমি যেরকম শাস্তির কথা বলবে আমি ঠিক সেরকম শাস্তি দেব।

আপনি তাকে ক্ষমা করে দিন।

না আমি ক্ষমা করব না। ওকে শাস্তি পেতেই হবে। ওর চোখ দু'টা গেলে দি— কি বল? উলের কাঁটা দিয়ে চোখ গেলে দি?

আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। আমি ধড়মড় করে উঠে বসলাম। তবে খুব চিন্তিত হলাম না। কারণ আমি স্বপ্ন বদলাতে পারি। আমি স্বপ্নটা বদলে ফেলব। কি ভাবে বদলাব সেটাও ঠিক করে ফেললাম। বিকেলে গানের টিচার চলে যাবার পর দরজা বন্ধ করে আমি স্বপ্নটা বদলাব। গানের টিচার গেলেন সন্ধ্যাবেলা। আমি আমার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করতেই শরিফার গলা শুনতে পেলাম। সে ফিস ফিস করে ডাকছে—আফা। ও আফা।

শব্দটা আসছে খাটের নীচ থেকে। আমি নিচু হয়ে দেখি শরিফা হামাগুড়ি দিয়ে খাটের নীচে বসে আছে। কুকুর যেভাবে বসে থাকে ঠিক সেভাবে শরিফা বসে আছে। কুকুরের মত জিভ বের করে খানিকটা হাঁপাচ্ছেও। তাকে কেমন যেন ভয়ংকর দেখাচ্ছে। আমি বললাম, তুমি এখানে কি করছ? বের হয়ে আস। খাটের নীচ থেকে বের হয়ে আস।

সে বলল, আফাগো আমি বাঁইচ্যা নাই। আমারে মাইরা ফেলছে। ছাদে কাপড় আনতে গেছিলাম আমারে ধাক্কা দিয়া ফেলছে। আমি অনেক দূর চইল্যা যাব। যাওনের আগে আফনেরে দেখা দেখতে আইছি গো।

==========================================

এই বলেই সে হামাগুড়ি দিয়ে আমার দিকে এগিয়ে আসতে গেল। আমি চিৎকার দিয়ে অজ্ঞান হয়ে গেলাম। সবাই ছুটে এলেও তখনই আমার ঘরে ঢুকতে পারল না। আমি ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলাম। তাদের ঢুকতে হল দরজা ভেঙ্গে।

আমি বলছি সন্ধ্যাবেলার ঘটনা। শরিফা যে সত্যি সত্যি মারা গেছে এই খবর জানা গেল রাত আটটার দিকে। আমাদের বাড়ির পেছনের দেয়ালে পড়ে তার মাথা থেতলে গিয়েছিল। কেউ তাকে ধাক্কা দিয়ে ছাদ থেকে ফেলে দিয়েছে। প্রচন্ড শক্তিশালী কেউ — কারণ দেয়ালটা বাড়ি থেকে অনেকটা দূরে—ছাদ থেকে ধাক্কা দিয়ে এত দূরে ফেলতে অনেক শক্তি দরকার।

আমার মাথা ধরছে। আমি আপাতত লেখা বন্ধ করলাম।

এই মুহূর্তে আপনি আমার সম্পর্কে কি ভাবছেন বলব?

আমি অন্তর্যামী নই। অন্য একজনের মনের খবর আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়। কিন্তু আপনি কি ভাবছেন তা আমি বলতে পারব। কারণ আপনার চিন্তার পদ্ধতি আমি জানি।

আপনি আমার লেখা পড়ছেন। যতই পড়ছেন আমার সম্পর্কে একটা ধারণা গড়ে উঠছে। ধারণাগুলি করছেন যুক্তির ভেতর দিয়ে। পুরোপুরি অংক কষা হচ্ছে দুই যোগ তিন হচ্ছে পাঁচ, কখনও ছয় বা সাত নয়। এ জাতীয় মানুষের মনের ভাব আঁচ করা মোটেই কঠিন না।

অতিপ্রাকৃত কোনও ব্যাপারে আপনার সামান্যতম বিশ্বাসও নেই। যেই আমি ছোট মা'কে দেখার কথা বলেছি ওমনি আপনি ভুরু কুঁচকেছেন। কঠিন কিছু শব্দ মনে মনে আওড়েছেন, যেমন স্কিজোফ্রেনিক, সাইকোপ্যাথ ...... তাই না?

শরিফার মৃত্যুর খবর শুনে আপনি খানিকক্ষণ ঝিম মেরে ছিলেন। তারপর সিগারেট ধরালেন। ধূমপায়ী মানুষরা সামান্যতম সমস্যার মুখোমুখি হলেই ফস করে সিগারেট ধরায়। ভাবটা এমন যে নিকোটিনের ধোঁয়া সব সমস্যা উড়িয়ে নিয়ে যাবে। সিগারেট ধরিয়ে মনে মনে বলেছেন—খুনটা কে করেছে? কারণ আপনার কাছে অতিপ্রাকৃত ব্যাপার বলে কিছু নেই। একটা মেয়ে খুন হয়েছে। ভুত প্রেত তাকে খুন করবে না। মানুষ খুন করবে। সেই মানুষটা কে?

ডিটেকটিভ গল্পে কি থাকে? একটা খুন হয়— আশেপাশের সবাইকে সন্দেহ করা হয়। সবচে কম সন্দেহ যাকে করা হয় দেখা যায় সেই খুন করেছে। গল্প উপন্যাসের ডিটেকটিভদের মত আপনি যদি খুন রহস্যের সমাধান করতে চান তাহলে প্রধান সন্দেহভাজন ব্যক্তি হচ্ছি আমি। এখন আপনি ভাবছেন মেয়েটা যে

==========================================

খুন করল তার মোটিভ কি? একটু চিন্তা করলে আপনি মোটিভও পেয়ে যাবেন। আমি আপনাকে সাহায্য করি?

ক) মেয়েটি মানসিক ভাবে অসুস্থ। স্কিজোফ্রেনিক এবং সাইকোপ্যাথ। একজন অসুস্থ মানুষ যে কোনও অপরাধ করতে পারে। অসুস্থতাই তার মোটিভ।

খ) শরিফা মেয়েটি তার স্বামীর কাছে বুধবারে চলে যাবে। সে ছিল ফারজানার সঙ্গিনী। ফারজানা চাচ্ছিল মেয়েটিকে রেখে দিতে। খুন করা হয়েছে সে কারণে। অসুস্থ মেয়েটি ভাবছে শরিফা খুন হয়েছে ঠিকই কিন্তু চলে যায় নি— এই তো সে বাস করছে খাটের নীচে। কুকুরের মত হাঁটু গেড়ে বসে আছে।

মিসির আলি সাহেব আপনি কি তাই ভাবছেন? না আপনি তা ভাবছেন না। মানুষের মনের ভেতরে যে আরেকটি মন বাস করে আপনি সেই মন নিয়ে কাজ করেন। যুক্তির ক্ষমতা আপনি যেমন জানেন যুক্তির অসারতাও আপনি জানেন। দুই যোগ তিন পাঁচ হয় এটা আপনি যেমন জানেন ঠিক তেমনি জানেন মাঝে মাঝে সংখ্যাকে যুক্ত করা যায় না। যোগ চিহ্ন কোনও কাজে আসে না। এই তথ্য জানেন বলেই—আমি আমার জীবনের বইটি আপনার সামনে খুলে দিয়েছি। আপনাকে পড়তে দিয়েছি।

আপনি হয়ত ভাবছেন— এতে লাভ কি? মেয়েটির সঙ্গে তো আমার কখনও দেখা হবে না। সে তার ঠিকানা দেয় নি। ঠিকানা দেই নি এটা ঠিক না। ব্যাখ্যা এবং বর্ণনা এমন ভাবে দিয়েছি যেন ইচ্ছা করলেই আপনি বের করতে পারেন আমাদের বাড়িটা কোথায়। ধানমন্ডি থানার ওসিকে আন্টি টেলিফোন করতে চাচ্ছে তা থেকে আপনি কি অনুমান করতে পারছেন না আমাদের বাড়ি ধানমন্ডিতে। টু ইউনিট বাড়ি এটিও বলেছি। আরও অনেক কিছু বলেছি। থাক এখন টেলিফোন নাম্বার দিয়ে দিচ্ছি। যদি মনে করেন আমার সঙ্গে কথা বলা দরকার টেলিফোন করবেন। নাম্বারটা হচ্ছে ষষ্ঠ মৌলিক সংখ্যা, পঞ্চম মৌলিক সংখ্যা, চতুর্থ মৌলিক সংখ্যা, তৃতীয় মৌলিক সংখ্যা। সংখ্যাগুলির আগে আট বসাবেন।

সরাসরি টেলিফোন নাম্বার লিখে দিলে হত। সেটা আপনার মনে থাকত না। এই ভাবে বলায় আর কখনও ভুলবেন না।

৮, (ষষ্ঠ মৌলিক সংখ্যা = ১১), (পঞ্চম মৌলিক সংখ্যা = ৭), (চতুর্থ মৌলিক সংখ্যা = ৫), (তৃতীয় মৌলিক সংখ্যা = ৩)

অর্থাৎ আমার টেলিফোন নাম্বার হচ্ছে—

৮১১৭৫৩

==========================================

আমাদের টেলিফোন নাম্বারটা রহস্যময় না? আমাদের বাসায় তিনটা টেলিফোন আছে। সবচে রহস্যময় নাম্বারটা আপনাকে দিলাম। এই টেলিফোন বাবা আমাকে দিয়েছেন। নাম্বারটা আমি কাউকে দেইনি। কাজেই আমার টেলিফোনে কেউ আমাকে পায় না। অথচ আমি অন্যদের পাই। ব্যাপারটা মজার না? তোমরা আমাকে খুঁজে পাবে না—কিন্তু আমি ইচ্ছা করলেই তোমাদের পেয়ে যাব।

মাঝে মাঝে আমার যখন ইনসমনিয়ার মত হয়—আমি এলোমেলো ভাবে টেলিফোনের ডায়াল ঘুরাতে থাকি। অচেনা কোনও একটা জায়গায় রিং বেজে ওঠে। সদ্য ঘুম ভাঙ্গা গলায় কেউ একজন ভারী গলায় বলে—কে?

আমি করুণ গলায় বলি, আমার নাম ফারজানা।

কাকে চাই?

কাউকে চাই না। আপনার সঙ্গে একটু কথা বলব, প্লীজ টেলিফোন রেখে দেবেন না। প্লীজ ! প্লীজ ! এই সময় পুরুষ মানুষরা যে কি অদ্ভুত আচরণ করে আপনি চিন্তাও করতে পারবেন না। শতকরা সত্তর ভাগ পুরুষ প্রেম করার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পরে। অতি মিষ্টি গলায় উত্তর দিতে থাকে। শতকরা দশ ভাগ কুৎসিত সব কথা বলে। অতি নোংরা, অতি কুৎসিত সব বাক্য। গলার স্বর থেকে মনে হয় মধ্য বয়স্ক পুরুষরা এই নোংরামীগুলি বেশি করেন। এই পুরুষরাই হয়ত স্নেহময় পিতা, প্রেমময় স্বামী। অফিসে আদর্শ অফিসার। কি অদ্ভুত বৈচিত্রের ভেতরই না আমাদের জীবনটা কাটে।

আমরা সবাই ডঃ জেকেল এবং মিষ্টার হাইড। আপনিও কিন্তু তাই—একদিকে অসম্ভব যুক্তিবাদী মানুষ অন্যদিকে .. যুক্তিহীন জগতেও চরম আস্থা আছে এমন একজন। তাই না? খুব ভুল কি বলেছি?



একটি তরুণী মেয়ে বাড়ির ছাদ থেকে পা ফসকে পড়ে গিয়ে মরে গেছে। ঘটনা খুব বিশ্বাসযোগ্য নয়। বয়স্কা মহিলা পা ফসকে পড়ে গেছেন— বিশ্বাসযোগ্য, অল্প বয়েসী মেয়ে পড়ে গেছে এটিও বিশ্বাসযোগ্য। তরুণী মেয়ের অপঘাতে মৃত্যু মানেই নানান প্রশ্ন। বিশেষ করে সেই মেয়ে যদি কাজের মেয়ে হয়।

আমার বাবাকে নিশ্চয়ই এইসব ঝামেলার মুখোমুখি হতে হয়েছে। কিছুদিন তাঁকে খুব চিন্তিত দেখেছি। তারপর এক সময় তিনি চিন্তামুক্ত হয়েছেন। বিত্তবানরা খুব সহজেই চিন্তামুক্ত হতে পারেন। তাদের সামান্য অর্থ ব্যয় হয়— এই যা।

শরিফার বাবাকে কিছু টাকা দেয়া হল— কত আমি জানি না। নিশ্চয়ই সে যত আশা করেছিল তারচে বেশি। কারণ সেই বেচারা টাকা হাতে নিয়ে আমাদের সবার মঙ্গল কামনা করে দীর্ঘ মোনাজাত শুরু করল। মোনাজাতের বিষয় বস্তু হচ্ছে—আমাদের মত ভালমানুষ সে তার জীবনে দেখেনি। আমাদের কাছে তার মেয়ে খুব সুখে ছিল। কপালে সুখ সইল না।

শরিফার স্বামীও বেশ কিছুদিন ঘোরাঘুরি করল। বেচারার দাবী সামান্য। যে সাইকেলটা তার জন্যে কেনা হয়েছিল সেই সাইকেল যেন তাকে দিয়ে দেয়া হয়। সম্ভব হলে পাঁচ হাজার এক টাকা। এই টাকাটা তো আইনত তারই প্রাপ্য— ইত্যাদি।

আন্টি তাকে ভাগিয়ে দিলেন এবং বলে দিলেন— কখনও যেন তাকে গেটের ভেতর ঢুকতে না দেয়া হয়।

সব ঝামেলা মিটে যাবার পর বাবা এক সন্ধ্যায় আমাকে ডাকলেন। বাবার পরিচয় আপনাকে দেয়া হয়নি— এখন দিচ্ছি। তিনি মোটামুটি কঠিন ধরনের মানুষ। তীক্ষ্ম বুদ্ধি। শান্ত— ধীর, স্থির। তিনি খুব রেগে গেলেও সহজ ভঙ্গিতে কথা বলতে পারেন। পেশায় তিনি পাইলট। সিঙ্গাপুর এয়ার লাইন্সের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে আছেন। আমার সব সময় মনে হয়েছে পাইলট না হয়ে বাবা যদি ইউনিভার্সিটির অংকের

টিচার হতেন তাঁকে খুব মানাত। বই পড়া তাঁর প্রধান শখ। বেশির ভাগ সময় আমি তাঁর হাতে বই দেখেছি। হাল্কা ধরনের বই না—বেশ সিরিয়াস ধরনের বই।

বাবা তাঁর স্টাডিতে একা বসেছিলেন। তাঁর সামনে একটা বাটিতে খেজুর গুড় টুকরো করা। শীতকালে খেজুর গুড় তাঁর প্রিয় একটা খাবার। প্রায়ই দেখেছি গল্পের বই পড়তে পড়তে তিনি খেজুর গুড়ের টুকরো মুখে দিচ্ছেন। আমি ঘরে ঢুকতেই বাবা বললেন— মা বস।

আমি তাঁর সামনে বসলাম।

কেমন আছ মা?

আমি বললাম, ভাল।

শরিফা মেয়েটি এইভাবে মারা গেল নিশ্চয়ই তোমার মন খুব খারাপ?

আমি বললাম, হ্যাঁ মন খারাপ।

বাবা ইতস্তত করে বললেন, তোমাকে কিন্তু কান্নাকাটি করতে দেখিনি। আমার কাছে তোমাকে বেশ স্বাভাবিকই মনে হয়েছে।

আমি বুঝতে পারলাম না বাবা ঠিক কি বলতে চাচ্ছেন। তাঁর কথা বলার মধ্যে জেরা করার ভাবটা প্রবল। যেন আমি কিছু গোপন করার চেষ্টা করছি বাবা তা বের করে ফেলতে চাচ্ছেন।

শরিফা যে সন্ধ্যায় মারা গেল—সেই সন্ধ্যায় তুমি কি ছাদে গিয়েছিলে?

না।

সেদিন ছাদে যাওনি?

না।

আমি যতদূর জানি—ছাদ তোমার খুব প্রিয় জায়গা। বেছে বেছে ঐ দিনই ছাদে যাও নি কেন?

ঐ দিন যেতে ইচ্ছে করেনি।

তুমি ঘরের দরজা বন্ধ করে চিৎকার করে কাঁদছিলে। দরজা ভেঙে তোমাকে বের করা হয়। তুমি প্রথম যে কথাটি তখন বল তা হচ্ছে শরিফা মারা গেছে। তাই না?

হ্যাঁ।

সে যে মারা গেছে তোমার তো জানার কথা না। কারণ কেউই জানে না। তুমি জানলে কিভাবে?

আমি চুপ করে রইলাম। বাবা বাটিটা আমার দিকে এগিয়ে দিতে দিতে বললেন— নাও গুড় খাও। আমি এক টুকরো গুড় নিয়ে মুখে দিলাম। বাবা শান্ত

গলায় বললেন, তুমি রাগ করে, কিংবা নিজের অজান্তে ওকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দাও নি তো?

না।

অনেক সময় খেলতে গিয়েও এরকম হয়। হয়ত হাসতে হাসতে ধাক্কা দিয়েছ—সে টাল সামলাতে না পেরে পড়ে গেছে। তোমার কোনও দোষ ছিল না।

না।

আচ্ছা ঠিক আছে। তোমার পড়াশোনা কেমন হচ্ছে?

ভাল।

গান কেমন হচ্ছে?

ভাল।

এবারের গানের টিচার কেমন?

ভাল।

গান কি তুলেছ না এখনও সারে গামা করে যাচ্ছ?

একটা গান তুলেছি।

কি গান?

নজরুল গীতি।

গানের লাইনগুলি কি?

পথ চলিতে যদি চকিতে—গাইব?

না থাক। আরেকদিন শুনব।

আমি কি এখন চলে যাব?

আচ্ছা যাও।

আমি উঠে চলে এলাম। বাবা ভুরু কুঁচকে বইয়ের পাতা উল্টাতে লাগলেন। তিনি আমাকে বিশ্বাস করেন নি এটা বোঝা যাচ্ছে। তিনি যে আমাকে নিয়ে খুব দুঃশ্চিন্তায় পড়েছেন তাও বুঝতে পারছি। খুব অল্প বয়েসেই আমি আসলে বেশি বেশি বুঝতে শিখেছিলাম। বেশি বুঝতে পারাটা এক ধরনের দুর্ভাগ্য। যারা কম বুঝতে পারে—এই পৃথিবীতে তারাই সবচে সুখি। বোকা মানুষরা কখনও আত্মহত্যা করে না।

বাবা আমার কথা বিশ্বাস না করলেও আন্টি করলেন। মজার ব্যাপার হচ্ছে নিজ থেকে তাঁকে আমার কিছু বলতে হল না। তিনি আপনাতেই সব বুঝতে পারলেন। ঘটনাটা এরকম— রাতে তিনি আমার সঙ্গে ঘুমুতে এসেছেন (শরিফার মৃত্যুর পর তিনি প্রতি রাতেই আমার সঙ্গে ঘুমুতেন।) বাতি নিভিয়ে আমাকে জড়িয়ে

ধরে মৃদু গলায় গল্প শুরু করলেন—তাদের গ্রামের বাড়ির গল্প। বাড়ির পেছনে একটা পেয়ারা গাছ ছিল। তিনি পাকা পেয়ারার খোঁজে গাছে উঠেছেন। হঠাৎ দেখলেন গাছের ডাল পেঁচিয়ে একটা সাপ। সাপটার গায়ের রঙ অবিকল পেয়ারা গাছের ডালের মত। সাপটা তাঁকে দেখে পালিয়ে গেল না—উল্টো তাঁর দিকে আসতে শুরু করল ......।

এই পর্যায়ে আন্টি গল্প থামিয়ে দিলেন। আমি বললাম, কি হয়েছে?

আন্টি বললেন, ফোঁপাচ্ছে কে? আমি ফোঁপানির শব্দ শুনছি। তুমি কি শুনছ?

শব্দ আমিও শুনছিলাম। ফোঁপাচ্ছে শরিফা। খাটের নীচে বসে মাঝে মধ্যেই সে ফোঁপানির মত শব্দ করে। আমি আন্টির প্রশ্নের জবাব দিলাম না। চুপ করে রইলাম।আন্টি বললেন, মনে হচ্ছে খাটের নীচে কেউ বসে আছে। ফোঁপাচ্ছে। তুমি শুনতে পাচ্ছ না?

না।

আমি পরিষ্কার শুনছি— পচা গন্ধও পাচ্ছি? তুমি গন্ধ পাচ্ছ না?

না।

আন্টি উঠে বসলেন। টেবিল ল্যাম্প জ্বালালেন। বিছানা থেকে নেমে তাকালেন খাটের নীচে। আমি তাকিয়ে রইলাম আন্টির মুখের দিকে। আমি দেখলাম ভয়ে এবং আতঙ্কে হঠাৎ আন্টির মুখ ছোট হয়ে গেল। তিনি বিড় বিড় করে কি যেন বললেন। কি বললেন, আমি বুঝতে পারলাম না। আন্টি ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলছিলেন। তার ফর্সা গাল হয়েছে টক টকে লাল। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। আন্টিকে দেখে মনে হচ্ছিল তিনি মাথা ঘুরে পড়ে যাবেন। আন্টি চাপা গলায় বললেন— কে কে?

আম্মা আমি শরিফা।

শরিফা!

জ্বে আম্মা। আমি এইখানে থাকি।

শরিফা!

জ্বে আম্মা। আমি হাঁটা চলা করতে পারি না — এইখানে থাকি। আমারে বিদায় দিয়েন না আম্মা। আমার যাওনের জায়গা নাই ...।

আন্টি উঠে দাঁড়ালেন। টলতে টলতে খাটের কাছে এসে— খাটে উঠলেন। আমাকে জড়িয়ে ধরে তৎক্ষণাৎ শুয়ে পড়লেন। আমি বললাম, কি হয়েছে?

আন্টি জড়ান গলায় বললেন, কিছু না। তুমি ঘুমাও।

আমি বললাম, খাটের নীচে কিছু দেখেছেন আন্টি?

তিনি বললেন, না। তুমি ঘুমাও। আমি সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়লাম। আন্টি

সম্ভবত সারা রাতই জেগে রইলেন। পরদিন ভোরে জেগে উঠে দেখি আন্টি হাঁটু মুড়ে বসে আছেন। ঘরে তখনও টেবিল ল্যাম্প জ্বলছে। আন্টির চোখ জ্বল জ্বল করছে। এক রাতেই তাঁর চোখের নীচে গাঢ় হয়ে কালি পড়েছে। আন্টি ক্লান্ত গলায় বললেন, ফারজানা তুমি কি রান্নাঘরে গিয়ে বলে আসবে আমাকে এক কাপ চা দিতে?

আমি বললাম, আন্টি আপনার কি শরীর খারাপ করেছে? তিনি বললেন, না। শরীর ভাল আছে।

আন্টি বিছানায় বসে চা খেলেন। তাঁকে খুব চিন্তিত মনে হল। আমাকে অবশ্যি তিনি কিছুই বললেন না। আমি সহজ স্বাভাবিক ভাবেই হাত মুখ ধুয়ে নাস্তা করলাম। স্কুলে চলে গেলাম। আন্টি সারাদিন আমার ঘরেই থাকলেন। ঘর থেকে বেরুলেন না।

বাবা সে সময় দেশে ছিলেন না। বছরে একবার পাইলটদের নতুন করে কি সব শেখায়। রিভিয়্যু হয়। বাবা সেই ট্রেনিং-এ তখন আমস্টারডামে। বাড়িতে আমি আর আন্টি। আন্টি আমার ঘরেই থাকেন। তিনি রাতে একেবারেই ঘুমান না। আমার কিন্তু ঘুম পায়। আগের অনিদ্রা রোগ তখন সেরে গেছে। বিছানায় যাবার কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ি। মাঝে মাঝে বাথরুম পেলে কিংবা পানির পিপাসা পেলে ঘুম ভাঙ্গে। আমি দেখি আন্টি মেঝেতে বসে আছেন। তার বসার ভঙ্গি শরিফার বসার ভঙ্গির মতই। তিনি মৃদু স্বরে শরিফার সঙ্গে কথা বলেন।

শরিফা!

জ্বি আম্মা?

কি করছ?

কিছু করনের নাই আম্মা। বইসা আছি।

এখান থেকে চলে যাও।

কই যামু? যাওনের জায়গা নাই। পথঘাটও চিনি না।

চাও কি তুমি?

কিছু চাই না। কি চামু?

দিনের বেলা তোমাকে দেখি না কেন? দিনে তুমি কোথায় যাও?

জানি না আম্মা। কি হইতেছে আমি কিছুই বুঝি না। দিশা পাই না।

তোমার ক্ষিধা হয়?

জ্বে হয়। জবর ভূখ লাগে— কিন্তু আম্মা খাওন নাই। আমারে কে খাওন দিব?

এখন ক্ষিধে হয়েছে?

==========================================

জ্বে হয়েছে।

বিস্কুট আছে খাবে? বিস্কুট দেব?

জ্বে না। আফনাগো খাওন আমি খাইতে পারি না।

তুমি কি খুব কষ্টে আছ?

বুঝি না আম্মা। কিচ্ছু বুঝি না। দিশা পাই না।

তুমি যে মারা গেছ তা কি জান?

জ্বে জানি।

কেউ কি তোমাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলেছে?

জ্বে।

কে ফেলেছে?

ছোট আফা ফেলছে। ছোট মানুষ বুঝে নাই। তার ওপরে রাগ হইয়েন না আম্মা।

ফারজানা তোমাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলেছে?

জ্বে।

তুমি কি তাকে দেখেছ ধাক্কা দিয়ে ফেলতে?

জ্বে না। পিছন থাইক্যা ধাক্কা দিছে। অন্য কেউও হইতে পারে।

অতি দ্রুত আন্টির শরীর খুব খারাপ করল। তিনি একেবারেই ঘুমুতে পারেন না। গাদা গাদা ঘুমের ওষুধ খান— তারপরেও জেগে থাকেন। সারাক্ষণ নিজের মনে বিড়বিড় করে কথা বলেন। অর্থহীন এলোমেলো সব কথা। হঠাৎ হাসতে শুরু করেন সেই হাসি কিছুতেই থামে না। আবার যখন কাঁদতে থাকেন— সেই কান্নাও চলতে থাকে।

বাবা যখন দেশে ফিরলেন তখন আন্টি পুরোপুরি উন্মাদ। কাউকেই চিনতে পারেন না। আমাকেও না। আন্টির চেহারাও খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল। মুখ শুকিয়ে মিসরের মমীদের মত হয়ে গেছে। দাঁত বের হয়ে এসেছে। সারা শরীরে বিকট গন্ধ। বাবা হতভম্ব হয়ে গেলেন। আন্টির চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হল। চিকিৎসায় কোনও লাভ হল না। ক্রমে ক্রমে তাঁর পাগলামী বাড়তে থাকল। বাবাকে দেখলেই তিনি ক্ষেপে উঠতেন। একদিন সকালে পাউরুটি কাটার ছুরি নিয়ে তিনি বাবার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ভয়ংকর কিছু ঘটে যেতে পারত। ভাগ্যক্রমে ঘটে নি—শুধু বাবার পিঠ কেটে রক্তারক্তি হয়ে গেল।

আন্টিকে ঘরে তালাবন্ধ করে রাখা হল। আন্টির বাবা এসে তাঁকে নিয়ে

==========================================

গেলেন। সেখানে থেকে তিনি কিছুটা সুস্থ হলেন। তখন তাঁকে আবার আমাদের এখানে আনা হল। তিনি আবারও অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তাকে তাদের বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়া হল।

মাঝে মধ্যে আমি ওনাকে দেখতে যেতাম। তিনি আমার সঙ্গে কথা বলতেন না। কঠিন চোখে তাকিয়ে থাকতেন। আন্টিদের বাড়ির কেউ চাইত না যে আমি যাই। আমি যাওয়া ছেড়ে দিলাম।

শরিফার প্রসঙ্গে আসি। শরিফার হাত থেকে আমি খুব সহজে মুক্তি পেয়ে যাই। শরিফাকে আমি এক রাতে বলি— শরিফা তোমার কি উচিত না তোমার স্বামীর সঙ্গে গিয়ে থাকা?

শরিফা বলল, জ্বে উচিত।

তুমি তার কাছে চলে যাও।

হে কই থাকে জানি না আফা।

আমি তাকে এনে দেব?

জ্বে আফা।

আমি শরিফার স্বামীকে খবর পাঠালাম সে যেন এসে তার সাইকেল নিয়ে যায়। সন্ধ্যার পর যেন আসে।

সে খুশি মনে সাইকেল নিতে এল। সাইকেলের সঙ্গে সে অন্য কিছুও নিয়ে গেল। মিসির আলি সাহেব—আপনার জন্যে বিস্ময়কর খবর হল— মাসখানেক পরে আমি খবর নিয়ে জানতে পারি শরিফার স্বামীর মাথা খারাপ হয়ে গেছে। তার আত্মীয় স্বজনরা তাকে পাবনা মানসিক হাসপাতালে ভর্তি করাতে নিয়ে গিয়েছিল। ভর্তি করাতে না পেরে শহরেই তাকে ছেড়ে দিয়ে চলে এসেছে।

==================================================



---

মিসির আলি সাহেব,

এই সম্বোধন বার বার করতে আমার কুৎসিত লাগছে। নামের শেষে সাহেব আবার কি? নামের শেষে সাহেব লাগালেই মানুষটাকে অনেক দূরের মনে হয়। দূরের মানুষের কাছে কি এমন অন্তরঙ্গ চিঠি লেখা যায়? একবার ভেবেছিলাম 'স্যার' লিখি। তারপর মনে হল— স্যার তো সাহেবের মতই দূরের ব্যাপার। মিসির আলি চাচা লিখব? না তাও সম্ভব না। মিসির আলি এমনই এক চরিত্র যাকে চাচা বা মামা ডাকা যায় না। গৃহী কোনও সম্বোধন তাঁকে মানায় না। দেখলেন আপনাকে আমি কত শ্রদ্ধা করি? না দেখেই কোনও মানুষকে এতটা শ্রদ্ধা করা কি ঠিক?

থাকুক তত্ত্ব কথা— নিজের গল্পটা বলে শেষ করি। অনেকদূর তো বলেছি — আপনি কি বুঝতে পারছেন যা বলছি সব সত্যি বলছি? অর্থাৎ আমি যা সত্যি বলে বিশ্বাস করছি তাই বলছি।

যতটুকু পড়েছেন সেখান থেকে কি বুঝতে পারছেন যে বাবার সঙ্গে আমার সম্পর্ক খুব ভাল না।

বাবা আমাকে পছন্দ করেন না।

কেন করেন না, আমি জানি না। আমি কখনও জিজ্ঞেস করি নি। কিন্তু বুঝতে পেরেছি। পছন্দ করেন না মানে এই না যে তিনি সারাক্ষণ ধমকাধমকি করেন। এইসব কিছুই না। মাঝে মাঝে গল্প করেন। লেজার ডিস্কে ভাল ছবি আনলে হঠাৎ বলেন, মা এসো ছবি দেখি। জন্মদিনে খুব দামী গিফট দেন। যতবারই বাইরে যান আমার জন্যে কিছু না কিছু নিয়ে আসেন। তারপরেও আমি বুঝতে পারি বাবা আমাকে তেমন পছন্দ করেন না। মেয়েরা এইসব ব্যাপার খুব সহজে ধরতে পারে। কে তাকে পছন্দ করছে কে করছে না— এই পর্যবেক্ষণ শক্তি মেয়েদের সহজাত। এই বিদ্যা তাকে কখনও শিখতে হয় না। সে জন্মসূত্রে নিয়ে আসে। ঐ যে কবিতা–

"এ বিদ্যা শিখে না নারী আসে আপনাতে"

আন্টি অসুস্থ হয়ে যাবার পর বাবা যেন কেমন কেমন চোখে আমাকে দেখতে লাগলেন। যেন আমিই আন্টিকে অসুস্থ করেছি। আমি যেন ভয়ংকর কোনও মেয়ে– আমার সংস্পর্শে যে আসবে সেই মানসিক ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়বে।

বাবার দুশ্চিন্তার কারণও আছে। ছোট মা অসুস্থ হবার পর আমার ঘরেই বেশির ভাগ সময় থাকতেন। তিনি ঘুমের ওষুধ খেয়ে আমার বিছানাতে শুয়ে মারা যান। যে রাতে তিনি মারা যান সে রাতে অনেকক্ষণ আমার সঙ্গে গল্প করেন। আমি ঘুমিয়ে পড়ার পর তিনি ঘুমের ওষুধ খান— একটা চিঠি লেখেন। তারপর আমার সঙ্গে ঘুমুতে আসেন। আমি ভোরবেলা জেগে উঠে দেখি তিনি কেমন অদ্ভুত ভঙ্গিতে শুয়ে আছেন— চোখ আধা খোলা। চোখের সাদা অংশ চকচক করছে। মুখ খানিকটা হা করা। হাত পা হিম হয়ে আছে। আমার তখন খুব কম বয়স। তারপরেও আমি বুঝলাম তিনি মারা গেছেন। আমি ভয় পেলাম না। চিৎকার দিলাম না। শান্ত ভঙ্গিতেই বিছানা থেকে নামলাম। দরজা ভেতর থেকে ছিটকিনি দেয়া। আমি চেয়ারে দাঁড়িয়ে ছিটকিনি খুলে বাবার ঘরে গিয়ে খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বাবাকে বললাম, ছোট মা মারা গেছেন।

বাবা তখন কফি খাচ্ছিলেন। তিনি খুব ভোর বেলা ওঠেন। নিজেই কফি বানিয়ে খান। তিনি মনে হল আমার কথা বুঝতে পারলেন না, কাপ নামিয়ে রেখে বললেন— মা কি বললে?

আমি আবারও বললাম, ছোট মা মারা গেছেন।

বাবা দ্বিতীয় শব্দ উচ্চারণ করলেন না।

আমার ঘরে এসে ঢুকলেন। এক পলক ছোট মা'কে দেখলেন।

তাঁর কপালে হাত রাখলেন। তারপর রাজ্যের বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে।

ছোট মা'র পর শরিফা মারা গেল। সেও থাকত আমার ঘরে। সেও কি মানসিক ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল? আমরা যদি ধরে নেই কেউ তাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলেনি তাহলে বুঝতে হবে শরিফা নিজেই ছাদ থেকে লাফ দিয়েছে। যে মেয়ে পরদিন স্বামীর কাছে যাবে সে এই কান্ড কখন করবে? মানসিক ভাবে অসুস্থ হলেই করবে। শরিফাও তাহলে অসুস্থ ছিল।

আন্টির অসুস্থতা তো চোখের সামনে ঘটল। আমার ঘরেই তার শুরু। কাজেই বাবা যদি ভেবে থাকেন প্রতিটি অসুস্থতার সঙ্গে আমার সম্পর্ক আছে তাহলে বাবাকে খুব একটা দোষ দেয়া যায় না।

==========================================

এক রাতে, খাবার টেবিলে তিনি বললেন—নিশা, তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে। আমি বললাম, বল।

বাবা বললেন, খাবার টেবিলে বলতে চাচ্ছি না, খাওয়া শেষ করে আমার ঘরে আস। দু'জন কথা বলি।

আমি বললাম, আচ্ছা।

তোমার বয়স এখন কত?

আমি বললাম, অক্টোবরে পনেরো হবে।

তাহলে তো তুমি অনেক বড় মেয়ে। তোমার বয়স পনেরো হতে যাচ্ছে তা বুঝতে পারি নি।

আমি হাসলাম। বাবা বললেন, তুমি যে খুব সুন্দর হয়েছ তা কি তুমি জান?

না।

কেউ তোমাকে বলে নি? তোমার বন্ধু বান্ধবরা?

না। আমার কোনও বন্ধুও নেই।

নেই কেন?

কারও সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয় না।

হয় না কেন?

আমি তো জানি না কেন হয় না। মনে হয় আমাকে কেউ পছন্দ করে না।

তোমাকে পছন্দ না করার তো কোনও কারণ নেই।

তুমি নিজেই আমাকে পছন্দ কর না। অন্যদের দোষ দিয়ে কি হবে?

আমি তোমাকে পছন্দ করি না?

না কর না।

তোমার এই ধারণা হল কেন?

আমি চুপ করে রইলাম। বাবাও চুপ করে গেলেন। মনে হচ্ছে তিনি খুব অস্বস্তিতে পড়ে গেছেন। অস্বস্তির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বিস্ময়বোধ। অতি কাছের একজনকে নতুন করে আবিষ্কারের বিস্ময়।

রাত দশটার দিকে বাবার ঘরে গেলাম। ইচ্ছে করে খুব সেজেগুজে গেলাম। লাল পাড়ের হাল্কা সবুজ একটা শাড়ি পরলাম। কপালে টিপ দিলাম। আয়নায় নিজেকে দেখে নিজেই চমকে গেলাম— কি সুন্দর লাগছে। মনে হচ্ছে বিয়ে বাড়ির মেয়ে। কনের ছোট বোন।

বাবা আমার সাজগোজ দেখে আরও ভড়কে গেলেন। বিব্রত গলায় বললেন, মা বোস। তোমাকে তো চেনা যাচ্ছে না

==========================================

আমি বসতে বসতে বললাম, তোমার জরুরি কথা শুনতে এসেছি।

বাবা বললেন, এত সেজেছ কেন?

এমনি সাজলাম। মাঝে মাঝে আমার সাজতে ইচ্ছা করে।

আমি আগে কখনও তোমাকে সাজতে দেখি নি।

আমাকে কি সুন্দর লাগছে না বাবা?

অবশ্যই সুন্দর লাগছে। কপালের টিপটা কি নিজেই এঁকেছ?

আমি বললাম, বাবা তুমি নানান কথা বলে সময় নষ্ট করছ। কি বলবে সরাসরি বলে ফেল। অস্বস্তি বোধ করার কিছু নেই।

অস্বস্তি বোধ করার কথা আসছে কেন?

তোমার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে তুমি অস্বস্তি বোধ করছ। তুমি বরং এক কাজ কর, দুই পেগ হুইস্কি খেয়ে নাও— এতে তোমার ইনহিবিশন কাটবে। যা বলতে চাচ্ছ সরাসরি বলে ফেলতে পারবে।

হুইস্কি খেলে ইনহিবিশন কাটে এই তথ্য জানলে কোত্থেকে?

গল্পের বই পড়ে। তোমার কাছ থেকে আমার গল্পের বই পড়ার অভ্যাস হয়েছে। আমিও দিন রাত বই পড়ি।

এটা একটা ভাল অভ্যাস।

বাবা তোমার কথাটা কি?

বাবা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ দুম করে বললেন, তোমার ভেতর কিছু রহস্য আছে। রহস্যটা কি?

আমি তোমার কথা বুঝতে পারছি না বাবা। তুমি কোন রহস্যের কথা বলছ? সব মানুষের মধ্যেই তো রহস্য আছে।

বাবা বললেন, সব মানুষের মধ্যে রহস্য আছে ঠিকই। তবে সেই সব রহস্য ব্যাখ্যা করা যায়। তোমার রহস্য ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে না। আমি সেটাই জানতে চাচ্ছি।

আমি এখনও তোমার কথা বুঝতে পারছি না।

বাবা উঠে দাঁড়ালেন। আলমারি খুলে হুইস্কির বোতল বের করলেন।

মিসির আলি সাহেব আপনাকে এতক্ষণ একটা কথা বলা হয় নি। লজ্জা লাগছিল বলেই বলতে পারিনি—আমার বাবা প্রচুর মদ্যপান করেন। এটা তাঁর অনেক দিনের অভ্যাস। আমার ধারণা মা যে মোটর অ্যাকসিডেন্টে মারা যান তার কারণ মাতাল অবস্থায় গাড়ি চালাতে গিয়ে বাবা অ্যাকসিডেন্ট করেন। আমি অবশ্যি এসব নিয়ে বাবাকে কখনও কোনও প্রশ্ন করিনি। আরেকটা কথা আপনাকে বলা হয়নি- -ছোট মা বাবার কাছ থেকে মদ্যপানের অভ্যাস করেছিলেন। এই অংশটি এতক্ষণ

গোপন রাখার জন্যে আপনি দয়া করে আমাকে ক্ষমা করবেন।

বাবা বললেন, নিশি শোন। নিজের সম্পর্কে তোমার কি ধারণা? তুমি নিজে কি মনে কর তোমার চরিত্রে কোনও অস্বাভাবিকতা আছে?

না।

তুমি নিশ্চিত যে তোমার মধ্যে কোনও অস্বাভাবিকতা নেই।

আমি নিশ্চিত।

তোমার আশেপাশে যারা থাকে তারা অস্বাভাবিক আচরণ করে কেন?

আমি জানি না। তুমিও তো আমার আশেপাশেই থাক— তুমি তো অস্বাভাবিক আচরণ কর না।

তুমি আমার সঙ্গে তর্ক করছ কেন?

তর্ক করছি না। তুমি প্রশ্ন করছ আমি তার জবাব দিচ্ছি।

আমি একজন সাইকিয়াট্রিস্টকে দিয়ে তোমাকে দেখাতে চাই।

বেশ তো দেখাও।

আগামী সপ্তাহে আমি মেরীল্যান্ডে যাচ্ছি। আমাদের সুপারসনিকের ওপর শর্ট ট্রেনিং হবে। তুমিও চল। সাইকিয়াট্রিস্ট তোমাকে দেখবে।

আচ্ছা।

মা ঠিক করে বল, তোমার মধ্যে কোনও অস্বাভাবিকতা নেই?

না।

তুমি তোমার ছোট মা'কে মাঝে মাঝে দেখতে পাও এটা কি সত্যি? তোমার আন্টি আমাকে বলেছিল।

হ্যাঁ সত্যি।

তুমি শরিফা মেয়েটিকেও দেখতে পাও।

আগে পেতাম এখন পাই না।

তোমার কাছে কি মনে হয় না— এই ব্যাপারগুলি অস্বাভাবিক?

না। কারণ শরিফাকে নীতু আন্টিও দেখেছেন।

হ্যাঁ সে আমাকে বলেছে। শরিফাকে এখন আর তুমি দেখতে পাও না?

না সে তার স্বামীর কাছে চলে গেছে। তবে আমি চাইলে সে আবার চলে আসবে।

বুঝিয়ে বল।

আমি স্বপ্নে যা দেখি তাই হয়। স্বপ্নে কি দেখতে চাই এটাও আমি ঠিক করতে পারি। কাজেই আমি যদি ভাবি স্বপ্নে দেখছি শরিফা চলে এসেছে তাহলে সে চলে

==========================================

আসবে। এবং তখন তুমি চাইলে তুমিও তাকে দেখতে পাবে।

এ ব্যাপারটাও তোমার কাছে নরমাল মনে হয়? অস্বাভাবিক মনে হয় না?

না, আমার কাছে অস্বাভাবিক মনে হয় না। আমার মনে হয় সব মানুষেরই ইচ্ছাপূরণ ধরনের স্বপ্ন দেখার ক্ষমতা আছে। কি করে সেই স্বপ্নটা দেখতে হয় তা তারা জানে না বলে স্বপ্ন দেখতে পারে না।

নিশি!

জ্বি।

তুমি এক কাজ কর। শরিফা মেয়েটিকে নিয়ে এসো আমি তাকে দেখতে চাই।

আচ্ছা।

ক'দিন লাগবে তাকে আনতে?

বেশি দিন লাগবে না। স্বপ্নটা দেখতে পেলেই সে চলে আসবে।

যত তাড়াতাড়ি পার তাকে নিয়ে এসো কারণ মেরীল্যান্ড যাবার আগে আমি তাকে দেখতে চাই।

আচ্ছা।

তোমার পড়াশোনা কেমন হচ্ছে?

খুব ভাল হচ্ছে।

গান শেখা কেমন হচ্ছে?

গান শেখাও ভাল হচ্ছে।

তোমার গানের স্যারের সঙ্গে ক'দিন আগে কথা হল। তিনি তোমার গানের গলার খুব প্রশংসা করলেন। তোমার নাকি কিন্নর কণ্ঠ।

সব গানের স্যাররাই তাদের ছাত্রছাত্রীদের গানের গলা সম্পর্কে এ জাতীয় কথা বলে। আমার গানের গলা ভাল না।

আমি তোমার গান একদিন শুনতে চাই।

এখন গাইব?

এখন গাইতে হবে না।

তোমার জরুরি কথা বলা কি শেষ হয়েছে বাবা?

হুঁ।

আমি চলে যাব?

হ্যাঁ যাও।

শরিফা মেয়েটি এলে আমাকে খবর দিও।

==========================================

আচ্ছা।

আমি আমার ঘরে এসে ঘড়ি দেখলাম, এগারোটা বাজতে দশ মিনিট বাকি। আমি রাত সাড়ে এগারোটার সময় আবার বাবার ঘরে গেলাম। তিনি সম্ভবত ক্রমাগতই মদ্যপান করে যাচ্ছেন। তাঁর চোখ খানিকটা লাল। মুখে বিবর্ণ ভাব। এমনিতে তিনি সিগারেট খান না—আজ খুব সিগারেট খাচ্ছেন। ঘর ধোঁয়ায় অন্ধকার হয়ে আছে। বাবা আমাকে দেখে অবাক হয়ে বললেন, কি ব্যাপার মা?

আমার ঘরে এসো।

কেন?

শরিফাকে দেখতে চেয়েছিলে শরিফা এসেছে।

তুমি না ডাকতেই চলে এসেছে?

আমি চুপ করে রইলাম। বাবা বললেন, শরিফা সত্যি এসেছে?

হ্যাঁ।

কি করছে?

আমার খাটের নীচে বসে আছে।

বাবা হাসলেন। অবিশ্বাসী মানুষের হাসি। বাবা বললেন, তুমি কি তার সঙ্গে কথাও বল?

হ্যাঁ বলি।

সে কি আমার সঙ্গে কথা বলবে?

জানি না। বলতেও পারে।

আমার ধারণা সে আমার সঙ্গে কথা বলবে না। আমি তাকে দেখতেও পাব না। কারণ শরিফা নামের মেয়েটি খাটের নীচে বসে নেই। তোমার মাথার ভেতর একটা ঘর আছে, যে ঘর অবিকল তোমার শোবার ঘরের মত। সেই ঘরের খাটের নীচে সে বসে আছে। কাজেই তাকে দেখতে পাবার কোনও কারণ নেই। বুঝতে পারছ?

পারছি।

কাজেই মেয়েটিকে দেখতে যাওয়া অর্থহীন।

তুমি যাচ্ছ না?

না।

আমি ফিরে আসছি বাবা পেছন থেকে ডাকলেন— নিশি দাঁড়াও আসছি। আমি দাঁড়ালাম। বাবার মদ্যপান আজ মনে হয় একটু বেশিই হয়েছে। তিনি সহজ ভাবে হাঁটতেও পারছেন না। সামান্য টলছেন। আমি বললাম, বাবা তোমার হাত

ধরব? তিনি বললেন, না। আই অ্যাম জাস্ট ফাইন।

বাবা আমার ঘরে ঢুকলেন। ঘরে টেবিল ল্যাম্প জ্বলছে—মোটামুটি আলো আছে। বাবা নিচু হয়ে খাটের নীচে তাকালেন। আমি তাকিয়ে রইলাম বাবার দিকে। অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম— বাবার শান্ত ভঙ্গি বদলে যাচ্ছে—তাঁর চোখে ভয়ের ছায়া। সেই ছায়া গাঢ় থেকে গাঢ়তর হচ্ছে। তিনি হতভম্ব চোখে আমার দিকে তাকালেন। তারপর দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলেন খাটের নীচে। তাঁর চোখে পলক পড়ছে না। আমি বললাম, বাবা কিছু দেখতে পাচ্ছ?

তিনি হ্যাঁ না কিছুই বললেন না। অদ্ভুত এক ধরনের শব্দ করতে লাগলেন। যেন তাঁর বুকে বাতাস আটকে গেছে তিনি তা বের করতে পারছেন না। খুব যারা বুড়ো মানুষ তারা এ ধরনের শব্দ করে। তবে নিজেরা সেই শব্দ শুনতে পায় না। অন্যরা শুনতে পায়।

আমি বাবাকে হাত ধরে টেনে তুললাম। তাঁকে ধরে ধরে তাঁর ঘরে নিয়ে গেলাম। তিনি প্রায় অস্পষ্ট স্বরে বললেন— প্রচুর মদ্যপান করেছি। আমার আবার লিমিট পাঁচ পেগ সেখানে আট পেগ খেয়েছি তো— তাই হেলুসিনেশন হচ্ছে। খাটের নীচে কিছুই ছিল না। কিছুই না। অন্ধকার তো, আলো ছায়াতে মানুষের মত দেখাচ্ছে। টর্চ লাইট নিয়ে গেলে কিছুই দেখব না।

টর্চ লাইট নিয়ে দেখতে চাও বাবা?

তিনি ক্লান্ত গলায় বললেন— না।

পরের সপ্তাহে আমি বাবার সঙ্গে মেরীল্যান্ড চলে গেলাম। মিসেস জেন ওয়ারেন নামের এক মহিলা সাইকিয়াট্রিস্ট আমার চিকিৎসা শুরু করলেন। মিসেস জেন ওয়ারেন এম ডি-র বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। আমেরিকান বৃদ্ধা মহিলারা খুব সাজ গোজ করেন। ঠোঁটে কড়া করে লিপস্টিক দেন, চুল পার্ম করেন, কানে রঙচঙা প্লাস্টিকের দুল পরেন। হাটুর উপরে খুব রঙিন— ঝলমলে স্কার্ট পরেন। তাঁদের দেখেই মনে হয় তাঁরা খুব সুখে আছেন।

মিসেস জেন ওয়ারেনও তাঁর ব্যতিক্রম নন। এত নাম করা মানুষ কিন্তু কেমন খুকি সেজে ছটফট করছেন। আহ্লাদী ভঙ্গিতে কথা বলছেন।

সাইকিয়াট্রিস্টদের অনেক ব্যাপার আমি লক্ষ্য করেছি। তাঁরা প্রথম যে কাজটি করেন তা হচ্ছে রোগীর সঙ্গে অত্যন্ত পরিচিত ভঙ্গিতে কথা বলেন। যেন রোগী তাঁর অনেক দিনের চেনা প্রায় বন্ধু স্থানীয়। মিসেস জেন ওয়ারেন এই কাজটা ভালই করেন। আমাকে দেখে প্রায় চেঁচিয়ে যে কথাটা বললেন তা হল — "ও ডিয়ার, তোমাকে আজ এত সুন্দর লাগছে কেন?" ভাবটা এ রকম যেন তিনি আমাকে

=====================================

আগেও দেখেছেন তখন এত সুন্দর লাগে নি। বিদেশীরা গায়ে হাত দিয়ে কথা বলে না— ইনি প্রথমবারেই গায়ে হাত রাখলেন।

তোমার নাম হল নিশি। আমার উচ্চারণ ঠিক হয়েছে?

হয়েছে।

নিশি অর্থ হল Night.

হ্যাঁ।

মুন লিট নাইট?

জানি না।

অফকোর্স মুন লিট নাইট। তোমাকে দেখেই মনে হচ্ছে তোমার জীবন আলোময়!

থ্যাংক য়্যু।

তোমার বয় ফ্রেন্ডের নাম কি?

আমার কোনও বয় ফ্রেন্ড নেই।

এমন রূপবতী কন্যার বয় ফ্রেন্ড থাকবে না কেন? অবশ্যই আছে। তুমি বলতে চাচ্ছ না? এইসব চলবে না— তোমার বয় ফ্রেন্ডের নাম বল, তার ছবি দেখাও।

ভদ্র মহিলা আমাকে বুঝতে চেষ্টা করছেন, আমিও কিন্তু তাঁকে বুঝতে চেষ্টা করছি। আমি যে তাঁকে বুঝতে চেষ্টা করছি সেটা মনে হয় তিনি ধরতে পারছেন না। বেশির ভাগ মানুষ নিজেদেরকে অন্যের চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান মনে করে। মিসেস জেনও তাই করছেন। আমাকে কিশোরী একটা মেয়ে ভেবে কথা বলছেন, মন জয় করার চেষ্টা করছেন। আমি এমন ভাব করছি যেন ভদ্রমহিলার কথা বার্তায় অভিভূত। আমি তাঁর প্রশ্নের জবাব দিচ্ছি। ঠিক যে জবাবগুলি তিনি শুনতে চাচ্ছেন— সেই জবাবগুলিই দিচ্ছি। কোনও মানুষ যখন প্রশ্ন করে তখন সে যে জবাব শুনতে চায় সেই জবাবটা কিন্তু প্রশ্নের মধ্যেই থাকে।

জেন ওয়ারেন বললেন, আচ্ছা নিশি বাবাকে কি তুমি খুব ভালবাস?

প্রশ্ন করার মধ্যেই কিন্তু যে জবাবটা তিনি শুনতে চাচ্ছেন সেটা আছে। তিনি শুনতে চাচ্ছেন যে-বাবাকে আমি মোটেই ভালবাসি না। এই জবাব শুনলে হয়ত তাঁর রোগ ডায়গনোসিসে সুবিধা হয়। কাজেই তাঁর এই প্রশ্নের জবাবে আমি মাথা নিচু করে বসে রইলাম এবং খুব অনিচ্ছার ভঙ্গিতে হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়লাম।

ভদ্রমহিলা দারুণ খুশি হয়ে গেলেন।

শোন নিশি— ইয়াং লেডি। যদিও তুমি এফারমেটিভ ভঙ্গিতে মাথা নেড়েছ তারপরেও মনে হয় তুমি সত্যি কথা বলছ না। আমরা বন্ধু, একজন বন্ধু—অন্য

==========================================

বন্ধুকে অবশ্যই সত্যি কথা বলবে তাই না! এখন বল— তুমি কি তোমার বাবাকে খুব ভালবাস?

আমি হ্যাঁ না কিছুই বললাম না।

ভদ্রমহিলা আমায় আরও কাছে ঘেঁষে এসে বললেন, তুমি কি বাবাকে পছন্দ কর না?

আমি আবারও চুপ করে রইলাম। ভদ্রমহিলা এবার প্রায় ফিস ফিস করে বললেন— তুমি কি তোমার বাবাকে ঘৃণা কর? আচ্ছা ঠিক আছে মুখে বলতে না চাইলে এখানে দু'টা কাগজ আছে একটাতে লেখা Yes এবং একটাতে No, যে কোনও একটা কাগজ তুলে নাও। প্রশ্নটা মন দিয়ে শোন —

তুমি কি তোমার বাবাকে ঘৃণা কর?

আমি Yes লেখা কাগজটা তুললাম। এবং এমন ভাব করলাম যে লজ্জায় দুঃখে আমায় মরে যেতে ইচ্ছা করছে। আমার চোখে পানি চলে এল। আমি এমন ভাব করছি যেন চোখের জল সামলাতে আমার কষ্ট হচ্ছে। এক সময় হাউ মাউ করে কেঁদে ফেললাম। বিদেশীরা চোখের পানি কম দেখে বলে চোখের পানিকে তারা খুব গুরুত্বের সঙ্গে দেখে। বাঙালী মেয়েরা যে অতি সহজে চোখের পানি নিয়ে আসতে পারে এই তথ্য তারা জানে না। তা ছাড়া আমি যে কত বড় অভিনেত্রী তাও তিনি জানেন না। তিনি ছুটে গিয়ে টিস্যু পেপার নিয়ে এলেন। নিজেই চোখ মুছিয়ে দিলেন। করুণা বিগলিত গলায় বললেন, শোন মেয়ে তোমার লজ্জিত বা দুঃখিত হবার কিছু নেই। আমেরিকান স্ট্যাটিসটিকস বলছে শতকরা ২৮.৬০ ভাগ আমেরিকান পুত্র-কন্যারা তাদের বাবাকে ঘৃণা করে। তুমি আমাকে যা বলেছ তোমার বাবা তা কোনও দিন জানবেন না। এই বিষয়ে তোমাকে আমি নিশ্চয়তা দিচ্ছি। এখন একটু শান্ত হও। কফি খাবে?

আমি ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললাম, খাব।

আমরা কফি খেলাম। ভদ্রমহিলা আনন্দিত গলায় বললেন— আমার ধারণা তোমার সমস্যা আমি ধরতে পারছি। সেই সমস্যার সমাধান করা এখন আর কঠিন হবে না। অবশ্যি তুমি যদি আমাকে সাহায্য কর। তুমি কি আমাকে সাহায্য করবে?

হুঁ।

ভেরী গুড। আমরা দু'জনে মিলে তোমার সমস্যা সমাধান করব। কেমন?

আচ্ছা।

তোমার বাবাকে তুমি কেন ঘৃণা কর?

বাবা মদ খায়।

শুধু মদ্যপান করে বলেই ঘৃণা কর?

মাতাল হয়ে তিনি একদিন গাড়ি চালাচ্ছিলেন তখন অ্যাকসিডেন্ট হয়। সেই অ্যাকসিডেন্টে আমার মা মারা যান।

তোমার বাবা আমাকে তোমার মা'র মৃত্যুর কথা বলেছেন। কিন্তু কি ভাবে মারা গেছেন তা বলেন নি। এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য।

জেন ওয়ারেন সিগারেট ধরালেন। তিনি বেশ কায়দা করে সিগারেট টানছেন।

নিশি, সিগারেটের ধোঁয়ায় তোমার অসুবিধা হচ্ছে না তো?

জ্বি না।

আমি সিগরেট ছাড়ার চেষ্টা করছি পারছি না। যে কোনও ভাল অভ্যাস সামান্য চেষ্টাতেই ছেড়ে দেয়া যায় — খারাপ অভ্যাস হাজার চেষ্টাতেও ছাড়া যায় না। ঠিক না?

ঠিক।

এখন বল তুমি না কি তোমার মা'কে দেখতে পাও এটা কি সত্যি?

না সত্যি না।

তাহলে বল এই মিথ্যা কথাটা কেন বলতে?

বাবাকে ভয় দেখাবার জন্যে বলতাম।

বাবাকে ভয় দেখানোর জন্যে তুমি তাহলে বানিয়ে বানিয়ে অনেক কথাই বলেছ?

জ্বি।

যা বলেছ তোমার বাবা তাই বিশ্বাস করেছেন?

জ্বি।

আচ্ছা আজকের মত তোমার সঙ্গে আমার কথা শেষ। কাল আবারও আমরা বসব। কেমন!

জ্বি আচ্ছা।

মেরীল্যান্ডে দেখার মত সুন্দর সুন্দর জিনিস অনেক আছে। তুমি কি দেখেছ?

জ্বি না।

কাল আমি তোমাকে লিস্ট করে দেব। দেশে যাবার আগে তুমি দেখে যাবে।

আচ্ছা।

তুমি কি জান যে তুমি খুব ভাল মেয়ে?

জানি।

ভদ্রমহিলা আমার সঙ্গে আরও তিন দিন সিটিং দিলেন। আমি তাঁকে

==========================================

পুরোপুরি বিভ্রান্ত করলাম। তাঁকে যা বিশ্বাস করাতে চাইলাম তিনি তাই বিশ্বাস করলেন এবং খুব আনন্দিত হলেন এই ভেবে যে তিনি বিদেশীনি এক কিশোরী মেয়ের জীবনের সমস্ত জটিলতা দূর করে ফেলেছেন। তাঁর অন্ধকার ঘরে এক হাজার ওয়াটের বাতি জ্বেলে দিয়েছেন।

আমার সম্পর্কে তিনি যা ধারণা করলেন তা হচ্ছে—

১) আমি খুব ভাল একটা মেয়ে, সরল, বুদ্ধি কম, জগতের জটিলতা কিছু জানি না।

(খুব ভুল ধারণা।)

২) আমি নিঃসঙ্গ একটি মেয়ে। আমার সবচে বড় শত্রু আমার নিঃসঙ্গতা।

(ভুল ধারণা। আমি নিঃসঙ্গ নই। আমি কখনও একা থাকি না। নিজের বন্ধু বান্ধব নিজে কল্পনা করে নেই। কল্পনাশক্তি সম্পন্ন মানুষ কখনও নিঃসঙ্গ হতে পারে না)

৩) আমি খুব ভীতু ধরনের মেয়ে।

(আবারও ভুল। আমার মধ্যে আর যাই থাকুক ভয় নেই। যখন আমার সাত আট বৎসর বয়স তখনও রাতে ঘুম না এলে আমি একা একা ছাদে চলে যেতাম।

৪) বাবাকে আমি অসম্ভব ঘৃণা করি।

(খুব ভুল কথা। বাবা চমৎকার মানুষ। আমার ক্ষুদ্র জীবনে যে ক'জন ভাল মানুষ দেখেছি তিনি তাদের একজন।)

আমি ভদ্রমহিলার মাথায় এইসব ভুল ঢুকিয়ে দিয়েছি। তিনি খুশি মনে ভুল গুলি গ্রহণ করেছেন।

মানুষ কি অদ্ভুত দেখেছেন? মানুষ কত সহজেই না 'ভুল' — সত্যি ভেবে গ্রহণ করে।

==========================================



আমেরিকান মহিলা মনস্তত্ত্ববিদ বাবাকে কি বলেছিলেন আমি জানি না। বাবাকে আমি জিজ্ঞেস করি নি। তবে অনুমান করতে পারি যে তিনি বাবাকে কিছু উপদেশ দিয়েছিলেন। বাবা দেশে ফিরেই সেই উপদেশ মত চলতে শুরু করলেন। প্রথমেই আমার শোবার ঘর বদলে দিলেন। তিনি হয়ত ভেবেছিলেন শোবার ঘর বদলানোর ব্যাপারে আমি খুব আপত্তি করব। নানান ভণিতা করে তিনি বললেন –

– মা তোমার এই ঘরটা খুব ছোট। তুমি বড় হয়েছ তোমার আরও বড় ঘর দরকার। তা ছাড়া আমি ভাবছি তোমাকে একটা কম্পিউটার কিনে দেব .... কম্পিউটার টেবিল সেট করার জন্যেও জায়গা লাগবে ........

আমি তাঁকে কথা শেষ করতে দিলাম না, তার আগেই বললাম — বাবা আমাকে তুমি একটা বড় ঘর দাও। এই ঘরটা আসলেই ছোট।

তাঁর মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি বললেন, নতুন ঘরে যখন যাচ্ছ তখন এক কাজ করা যাক। নতুন ঘরের জন্যে আলাদা করে ফার্নিচার কেনা যাক।

আমি বলাম, আচ্ছা।

বাবা বললেন, আমার পাশের ঘরটা তুমি নিয়ে নাও। বাবা-মেয়ে পাশাপাশি থাকব, কি বল? ভাল হবে না?

খুব ভাল হবে বাবা।

আমার ঘর বদল হল। নতুন ফার্নিচার এল। যা ভেবেছিলাম তাই হল, পুরানো খাট বদলে কেনা হল আধুনিক বক্স খাট। যার নীচে বসার উপায় নেই। সাইকিয়াট্রিস্ট নিশ্চয়ই বাবাকে এই বুদ্ধি দিয়ে দিয়েছিলেন। একদিন কলেজ থেকে ফিরে দেখি— আমার আগের শোবার ঘরের কোনও ফার্নিচার নেই। সব ফার্নিচার কোথায় যেন পাচার করা হয়ে গেছে। বাবার পাশের ঘরটা সুন্দর করে সাজানো। নতুন ফার্নিচার। একটা টেবিলে ঝকঝকে কম্পিউটার।

=======================================

কম্পিউটার কিনে দেবার কথাও হয়ত সাইকিয়াট্রিস্ট বাবাকে বলে দিয়েছিলেন। কম্পিউটারে নানা ধরনের খেলা নিয়ে আমি ব্যস্ত থাকব। খাটের নীচে কে বসে আছে তা নিয়ে মাথা ঘামাব না ।

নতুন ঘরে থাকতে এলাম। বাবা আবার ঘরের দরজায় লাল ফিতা দিয়ে রেখেছেন। ফিতা কেটে ঢুকতে হবে। গৃহ-প্রবেশের মত ঘর-প্রবেশ অনুষ্ঠান।

বাবা বললেন, এস. এস. সি তে তুমি খুব ভাল রেজাল্ট করেছ বলে এই কম্পিউটার।

আমি বললাম, থ্যাংক য়্যু।

নতুন যুগের কম্পিউটার— খুব পাওয়ারফুল। টু গিগা বাইট মেমোরী। এই কম্পিউটার দিয়ে তুমি অনেক কিছু করতে পারবে।

অনেক কিছু মানে কি?

কম্পিউটার গ্রাফিকস করা যাবে। এনিমেশন করা যাবে। ইচ্ছে করলে ডিজনীর মত — "লিটল মারমেইড" জাতীয় কার্টুন ছবিও বানিয়ে ফেলতে পার। তোমার যা বুদ্ধি, ভাল কম্পিউটার পেলে তুমি অনেক কিছু করতে পারবে।

আমার যে খুব বুদ্ধি তা তুমি বুঝলে কি করে?

তোমার রেজাল্ট দেখে বুঝেছি । আমি তো কল্পনাও করি নি তুমি এত ভাল রেজাল্ট করবে।

মিসির আলি সাহেব, প্রচন্ড মানসিক যন্ত্রণা নিয়েও আমি খুব ভাল রেজাল্ট করি। কেমন ভাল জানেন? সব পত্রিকায় আমার ছবি ছাপা হয়। আমার প্রিয় লেখক কে, প্রিয় গায়ক কে, প্রিয় খেলোয়াড় কে এইসবও ছাপা হয়।

ঐ প্রসঙ্গ থাক। কম্পিউটার প্রসঙ্গে চলে আসি। বাবা শুধু যে আমাকে কম্পিউটার কিনে দিলেন তাই না— আমাকে সব কিছু শেখানোর জন্যে একজন ইন্সট্রাকটার রেখে দিলেন। ইন্সট্রাকটারের নাম— হাসিবুর রহমান। লোকটা লম্বা, রোগা। ইটে চাপা পড়ে থাকা ঘাসের মত চেহারা। বয়স এই ধরুন পঁচিশ-ছাব্বিশ। দেখতে ভাল। মেয়েদের মত টানা টানা চোখ। একটা ভুল কথা বলে ফেললাম। সব মেয়েদের তো আর টানা টানা চোখ থাকে না।

কম্পিউটারের সব বিষয়ে হাসিবুর রহমানের জ্ঞান অসাধারণ। কিন্তু লোকটি হত দরিদ্র। তার থাকার জায়গা পর্যন্ত নেই। রাতে সে ঘুমায় একটা কম্পিউটারের দোকানে। তাকে অতি সামান্য কিছু টাকা সেই দোকান থেকে দেয়া হয়— এতে তার দু'বেলা খাওয়াও বোধ হয় না, তবে এতেই সে খুশি। এত অল্পতে কাউকে খুশি হতেও আমি দেখি নি।

==========================================

বাবা আমাদের বাড়িতে তাকে থাকতে দিলেন। আমাদের গ্যারেজে তিনটা কামরা আছে। একটা দারোয়ানের, একটা ড্রাইভারের। একটা কামরা খালি। সেই খালি কামরাটায় তাকে থাকতে দেয়া হল। সে মহা খুশি। সারাদিন ঘষামাজা করে ঘর সাজাল। আমার কাছে এসে ক্যালেন্ডার চাইল—দেয়ালে সাজাবে।

তার পড়াশোনা সামান্য। এস. এস. সি সেকেন্ড ডিভিশন। টাকা পয়সার অভাবে এস. এস. সি–র বেশি সে পড়তে পারে নি। কম্পিউটারের দোকানে কাজ নিয়েছে। নিজের আগ্রহে কম্পিউটার শিখেছে।

ভদ্রলোককে আমার কয়েকটি কারণে পছন্দ হল। প্রথম কারণ তিনি আমাকে অত্যন্ত সম্মান করেন। আমাকে দেখা মাত্র লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ান। দ্বিতীয় কারণ আমার প্রতিটি কথা তিনি বিশ্বাস করেন।

যেহেতু তিনি আমাকে কম্পিউটার শেখাতে এসেছেন প্রথম দিনই আমি তাঁকে স্যার ডাকলাম। তিনি খুবই লজ্জা পেয়ে বললেন, ম্যাডাম আপনি আমাকে স্যার ডাকবেন না। আমার খুবই লজ্জা লাগছে।

আপনাকে তাহলে কি ডাকব?

নাম ধরে ডাকবেন। আমার নাম হাসিব।

আপনাকে হাসিব ডাকব?

জ্বি।

আচ্ছা বেশ তাই ডাকব।

আমি সহজ ভাবেই তাকে হাসিব ডাকা শুরু করলাম। ভদ্রলোক আমার কম্পিউটারের টিচার হলেও তার সঙ্গে আমার কথা বার্তার ধরন ছিল মুনিব–কন্যা এবং কর্মচারীর মত। আমার তাতে কোনও অসুবিধা হচ্ছিল না। ওনারও হচ্ছিল না। স্যার ডাকলেই হয়ত অনেক বেশি অসুবিধা হত।

কম্পিউটারের নানান বিষয় আমি খুব আগ্রহ নিয়ে শিখতে লাগলাম। উনিও খুব আগ্রহ নিয়ে শেখাতে লাগলেন। বুদ্ধিমতি আগ্রহী ছাত্রীকে শেখানোর মধ্যেও আনন্দ আছে। সেই আনন্দ তাঁর চোখে মুখে ফুটে উঠত। রাত জেগে জেগে তাঁর সঙ্গে আমি 3D STUDIO এবং MICRO MEDIA DIRECTOR এই দু'টি প্রোগ্রাম শিখছি। একটা সফটওয়ার তৈরি করছি। যে সফটওয়ারে কম্পিউটারের পর্দায় শরিফা এসে উপস্থিত হবে। তাকে প্রশ্ন করলে সে প্রশ্নের জবাব দেবে। সহজ প্রশ্ন কিন্তু অদ্ভুত জবাব। যেমন,

প্রশ্ন : আপনার নাম?

উত্তর : আমার কোনও নাম নেই, আমি হচ্ছি ছায়াময়ী। ছায়াদের কি নাম

থাকে?

প্রশ্ন : আপনার পরিচয় কি?

উত্তর : আমার কোনও পরিচয়ও নেই। পরিচয় মানেই তো ব্যাখ্যা ও বর্ণনা। আমাকে ব্যাখ্যা ও বর্ণনায় ধরা যাবে না।

পর্দায় প্রশ্নের উত্তরগুলি লেখা হবে না। পর্দায় ভাসবে শরিফার বিচিত্র সব ছবি এবং উত্তরগুলি ধাতবকণ্ঠে শোনা যাবে।

হাসিব একদিন জিজ্ঞেস করলেন (খুব ভয়ে ভয়ে। আমাকে যে কোনও প্রশ্নই খুব ভয়ে ভয়ে করেন। ভাবটা এ রকম যেন প্রশ্ন শুনলেই আমি রেগে যাব) —

শরিফা কে?

আমি বললাম শরিফা একটি মৃতা মেয়ে।

ও আচ্ছা।

আপনি কি ভূত বিশ্বাস করেন?

জ্বি করি। করব না কেন?

ভূত দেখেছেন কখনও?

জ্বি না।

আপনি যদি শরিফাকে দেখতে চান আমি তাকে দেখাতে পারি। ওর সঙ্গে আমার ভাল পরিচয় আছে। আমি বললেই সে আসবে।

জ্বি না দেখতে চাই না। আমি খুব ভীতু।

আমি ডাকলেই শরিফা চলে আসবে আপনি এটা বিশ্বাস করলেন?

বিশ্বাস করব না কেন? আপনি তো আর শুধু শুধু মিথ্যা কথা বলবেন না। আপনি সেই ধরনের মেয়ে না।

আমি কোন ধরনের মেয়ে?

খুব ভাল মেয়ে।

আপনি কম্পিউটারের মত আধুনিক জিনিস নিয়ে নাড়াচাড়া করেন, আবার ভূতও বিশ্বাস করেন?

জ্বি ভূত বিশ্বাস করি, জ্বীনও বিশ্বাস করি। কোরান শরীফে জ্বীনের কথা আছে। একটা সূরা আছে— সূরার নাম হল — সুরায়ে জ্বীন।

তাই বুঝি?

জ্বি।

আপনি আমাকে একটা ভুতের গল্প বলুন তো।

ম্যাডাম আমি ভুতের গল্প জানি না।

==================================================

কিছু না কিছু নিশ্চয়ই জানেন মনে করে দেখুন। ছোটবেলায় ভয় পেয়েছিলেন এমন কিছু।

খুব ছোটবেলায় একবার শ্মশান–কোকিলের ডাক শুনেছিলাম।

কিসের ডাক শুনেছিলেন?

শ্মশান–কোকিল। ভয়ংকর ডাক। কেউ যদি শ্মশান–কোকিলের ডাক শোনে তার নিকট আত্মীয় মারা যায়।

আপনার কি কেউ মারা গিয়েছিল?

আমার বাবা মারা গিয়েছিলেন।

মৃত্যুর পর তাঁকে কখনও দেখেছেন?

প্রায়ই স্বপ্নে দেখি।

স্বপ্নের কথা বলছি না। জাগ্রত অবস্থায় তাঁকে কখনও দেখেছেন?

জ্বি না।

শ্মশান–কোকিল পাখিটা দেখতে কেমন?

দেখতে কেমন জানি না ম্যাডাম। শ্মশানের আশে পাশে থাকে। কেউ দেখে না।

আপনাদের গ্রামে শ্মশান আছে?

জ্বি আছে। মহাশ্মশান। খুব বড়।

আমার শ্মশান দেখতে ইচ্ছে করছে। আপনি কি আমাকে আপনাদের গ্রামে নিয়ে যাবেন।

উনি হতভম্ব গলায় বললেন, থাকবেন কোথায়?

কেন আপনাদের গ্রামের বাড়িতে।

অসম্ভব কথা বলছেন ম্যাডাম। আমরা খুবই গরীব। খড়ের চালা ঘর। মাটির দেয়াল।

হাসিব খুবই নার্ভাস হয়ে গেলেন। তার ভাবটা এ রকম যেন এখনই তাকে নিয়ে আমি তাদের গ্রামের বাড়িতে রওনা হচ্ছি। মানুষের সারল্য যে কোন পর্যায়ে যেতে পারে তা তাকে না দেখলে বিশ্বাস করা মুশকিল। তবে হাসিব বোকা ছিলেন না। আমাদের ধারণা সরল মানুষ মানেই বোকা মানুষ এই ধারণা সত্যি নয়।

মিসির আলি সাহেব আপনার কি ধারণা আমি এই মানুষটার প্রেমে পড়েছি?

আমার মনে হয় না। মানুষটাকে আমি করুণা করতাম। প্রেম এবং করুণা এক ব্যাপার নয়। প্রেম সর্বগ্রাসী ব্যাপার। প্রেমের ধর্ম হচ্ছে অগ্নি। আগুন যেমন সব

==========================================

পুড়িয়ে দেয় প্রেমও সব ছাড়খার করে দেয়। হাসিব নামের মানুষটির প্রতি প্রবল করুণা ছাড়া আমি কিছু বোধ করি নি।

তাঁর সঙ্গে আমার কথা বলতে ভাল লাগতো — এই পর্যন্তই। আমি নিঃসঙ্গ একটা মেয়ে, কারও সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছা হওয়াটাকে আপনি নিশ্চয়ই অস্বাভাবিক বলবেন না।

ছোটবেলা থেকেই আমার অনেক খেলনা ছিল। খেলনা নিয়ে খেলতে ভাল লাগত। হাসিবের সঙ্গে আমার ব্যাপারটাও সেরকম। সে ছিল আমার কাছে মজার একটা খেলনার মত।

তাঁকে আমি ভয়ংকর ভয়ংকর গল্প বলে ভয় দেখাতাম। শরিফার গল্প। আমার ছোট মা'র গল্প। মানুষটা ভয়ে আতঙ্কে অস্থির হয়ে যেত। দেখে আমার এমন মজা লাগত।

আমি তখন একটা অন্যায় করলাম। খুব বড় ধরনের অন্যায়। একটা নির্দোষ খেলাকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যাবার অন্যায়। আমি তাঁকে ভয় দেখালাম। কি ভাবে ভয় দেখালাম জানেন? শরিফা সেজে ভয় দেখালাম।

তিনি সে রাতে আমাকে কম্পিউটার শেখানো শেষ করে তাঁর ঘরে ঘুমুতে যাবেন, আমি বললাম, আপনি কি ভাত খেয়েছেন?

তিনি বললেন, জ্বি না। ভাত রাঁধব তারপর খাব।

আমি বললাম, এত রাতে ভাত রেঁধে খেতে হবে না। আমি বুয়াকে বলে দিচ্ছি— আপনাকে খাইয়ে দেবে। একেবারে খাওয়া দাওয়া করে তারপর ঘুমুতে যান।

তিনি সুবোধ বালকের মত মাথা নাড়লেন।

হাসিব যখন ভাত খাচ্ছিলেন তখন আমি গ্যারেজে তাঁর ঘরে উপস্থিত হলাম। কেউ আমাকে দেখল না। দারোয়ান দু'জনই ছিল গেটে। ড্রাইভার বাইরে। আমি কয়েক সেকেন্ড ভাবলাম তারপর হুট করে তাঁর ঘরে ঢুকে গেলাম। ঠিক করে রাখলাম অনেক রাত পর্যন্ত খাটের নীচে বসে থাকব। তিনি খাওয়া শেষ করে ঘরে ঢুকবেন। দরজা লাগাবেন। তারপর ঘুমিয়ে পড়বেন। তখন হাসির শব্দ করে তাঁর ঘুম ভাঙ্গাব। ঘুম ভাঙ্গতেই তিনি শব্দ শুনে খাটের নীচে তাকাবেন— আধো আলো আধো অন্ধকারে এলোমেলো চুলে শরিফা বসে আছে ..... সম্পূর্ণ নগ্ন এক ভয়ংকর তরুণী। তাঁর কাছে কি ভয়ংকরই না লাগবে ! ভাবতেও আনন্দ !

==========================================



কে বলছেন?

আমার নাম মিসির আলি।

স্লামালিকুম।

ওয়ালাইকুম সালাম। কে কথা বলছ—নিশি?

জ্বি।

তুমি ভাল আছ?

জ্বি।

আরও আগেই টেলিফোন করতাম—আমার নিজের টেলিফোন নেই। আমি সাধারণত একটা পরিচিত দোকান থেকে ফোন করি। সেই দোকান গত এক সপ্তাহ ধরে বন্ধ।

বন্ধ কেন?

জানি না কেন। খোঁজ নেইনি।

একটা দোকান এক সপ্তাহ হল বন্ধ। আর আপনি হলেন বিখ্যাত মিসির আলি। আপনি খোঁজ নেবেন না?

খোঁজ নেয়াটা তেমন জরুরি মনে করিনি।

আমার তো ধারণা ব্যাপারটা খুবই জরুরি। বড় ধরনের কোনও কারণ ছাড়া কেউ এক সপ্তাহ ধরে দোকান বন্ধ রাখে না। আজ কি আপনি সেই দোকান থেকে টেলিফোন করছেন?

হ্যাঁ।

ওরা দোকান বন্ধ রেখেছিল কেন?

দোকানের মালিকের মেয়ের বিয়ে ছিল। তিনি দোকানের সব কর্মচারীদের নিয়ে দেশের বাড়িতে গিয়েছিলেন।

===============================================

ও আচ্ছা। মেয়ের বিয়েতে আপনাকে দাওয়াত দেয়নি?

না। আমার সঙ্গে তেমন পরিচয় নেই।

কম পরিচয় থাকলেও তো আপনাকে দাওয়াত দেয়ার কথা। আপনি এত বিখ্যাত ব্যক্তি। বিখ্যাত মানুষরা খুব দাওয়াত পায়। সবাই চায় তাদের অনুষ্ঠানে বিখ্যাতরা আসুক।

তুমি যত বিখ্যাত আমাকে ভাবছ আমি তত বিখ্যাত নই।

আপনি কি আমার লেখাটা পড়েছেন?

হ্যাঁ।

পুরোটা পড়েছেন?

না পুরোটা পড়িনি।

কতদূর পড়েছেন?

তুমি হাসিব সাহেবকে ভয় দেখানোর জন্যে খাটের নীচে বসে রইলে পর্যন্ত।

বাকিটা পড়েন নি কেন?

আমার যতটুকু পড়ার পড়ে নিয়েছি। বাকিটা পড়ার দরকার বোধ করছি না। আমার মনে হচ্ছে সবটা পড়ে ফেললে কনফিউজড হয়ে যাব। আমি কনফিউজড হতে চাচ্ছি না। তোমার লেখার প্রধান লক্ষ্য মানুষকে কনফিউজ করা বিভ্রান্ত করা।

আপনি একটু ভুল করছেন। এই লেখাগুলি আমি আপনার জন্যে লিখেছি – মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্যে লিখি নি।

তা ঠিক । হ্যাঁ আমাকে বিভ্রান্ত করা তোমার প্রধান লক্ষ্য ছিল।

আমার ধারণা ছিল আপনি পুরো লেখাটা পড়বেন তারপর টেলিফোন করবেন।

তোমার সব ধারণা যে সত্যি হবে তা মনে করা কি ঠিক?

সাধারণত আমার সব ধারণাই সত্যি হয়।

শোন নিশি আমি তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই।

কথা তো বলছেন।

এ ভাবে না। মুখোমুখি বসে কথা বলতে চাই। তোমার পান্ডুলিপিও নিশ্চয়ই তুমি ফেরত চাও। চাও না?

চাই।

আমার কাছে তোমার কিছু জিনিস পত্রও আছে। হ্যান্ডব্যাগ স্যুটকেস। বেশ কিছু টাকা।

ওগুলি আমি নেব না।

টাকা নেবে না?

টাকাটা আপনি রেখে দিন। আপনি রহস্য সমাধানের জন্যে অনেক কর্মকান্ড করেন আপনার টাকার দরকার হয়। যেমন ধরুন আমার ছোট মা'র মৃত্যু কি ভাবে হয়েছিল। কেইস কি দেয়া হয়েছিল? পোস্টমর্টেম রিপোর্ট কি ছিল তা জানার জন্যে আপানি টাকা খরচ করেন নি?

করেছি। অতি সামান্যই করেছি।

আচ্ছা একটা কথা— আমাদের বাড়ির ঠিকানা কি আপনি আমার লেখা পড়ে জেনেছেন না আগেই জেনেছেন?

আগেই জেনেছি। থানা থেকে জেনেছি।

আপনি পুরানো পত্রিকা ঘাটেন নি?

ঘেটেছি। আমি নিজে ঘাটি নি—একজনকে ঠিক করেছিলাম সে ঘেটেছে। তবে সেখান থেকে বাড়ির ঠিকানা পাই নি।

আপনি যে এইসব কর্মকান্ড করবেন তা কিন্তু আমি জানতাম।

তুমি বুদ্ধিমতি মেয়ে।

আপনি কি আন্টির সঙ্গে দেখা করেছেন— নীতু আন্টি। তিনি তো এখন মোটামুটি সুস্থ।

ওনার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছি। উনি দেখা করেন নি। শোন নিশি আমি কি এখন আসব?

না আজ না।

আজ না কেন?

বাবা বাড়িতে আছেন এই জন্যে আজ না। যদিও বাবা আপনাকে খুব শ্রদ্ধা করেন। বাবার ধারণা আপনি সাধারণ মানুষ নন। আপনি মহাপুরুষ পর্যায়ের মানুষ। আপনার ওপর লেখা বইগুলি বাবাই আমাকে প্রথম পড়তে দেন।

তোমার বাবার সঙ্গে তাহলে তো দেখা করাটা খুবই জরুরি।

জরুরি কেন?

তোমার বাবা যাতে বুঝতে পারেন যে আমি মহাপুরুষ পর্যায়ের কেউ নই— আমি খুবই সাধারণ একজন মানুষ।

আপনি আমার সমস্যার সমাধান করেছেন?

হ্যাঁ।

অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে আপনি কথা বলছেন, এত আত্মবিশ্বাস থাকা কি ঠিক?

==========================================

না ঠিক না। তবে তোমার ক্ষেত্রে আমি ভুল করি নি।

একটা জিনিস শুধু জানতে চাচ্ছি—আমি যে খাটের নীচে শরিফাকে দেখতে পাই এবং এখনও দেখতে পাই তা কি আপনি বিশ্বাস করেন?

করি।

আপনি কি শরিফাকে দেখতে চান?

না চাই না। অস্বাভাবিক কিছু আমার দেখতে ভাল লাগে না। আমি স্বাভাবিক মানুষ। আমি আমার চারপাশে স্বাভাবিক কর্মকান্ড দেখতেই আগ্রহী।

পৃথিবীতে সব সময়ই কি স্বাভাবিক কর্মকান্ড ঘটে?

না ঘটে না।

আচ্ছা আপনি আসুন।

কখন আসব?

আজই আসুন। রাতে আমার সঙ্গে খাবেন। আমি নিজে আপনার জন্যে রান্না করব।

তুমি রাঁধতে জান?

সহজ রান্নাগুলি জানি। যেমন ডিম ভাজতে পারি। ডাল চচ্চড়ি পারি। ভাত রাঁধতে অবশ্যি পারি না। হয় ভাত নরম জাউ জাউ হয়ে যায় আর নয়ত চালের মত শক্ত থাকে। আমি আপনাকে গরম গরম ডিম ভেজে দেব। ডিম ভাজা কি আপনার পছন্দের খাবার?

হ্যাঁ খুব পছন্দের খাবার।

আপনি কি আইসক্রীম পছন্দ করেন?

হ্যাঁ করি।

আমিও খুব আইসক্রীম পছন্দ করি। বাবা পরশু হংকং থেকে দু' লিটারের একটা আইসক্রীম এনেছেন। বিমানের ক্যাপ্টেন হবার অনেক সুবিধা। প্লেনের ফ্রীজে করে নিয়ে এসেছেন—এত ভাল আইসক্রীম আমি অনেক দিন খাই নি। কালো রঙের আইসক্রীম। আপনাকে খাওয়াব।

আচ্ছা। আমি কি টেলিফোন রাখব?

জ্বি না আরেকটু ধরে রাখুন। আচ্ছা শুনুন এই দীর্ঘ সময় যে টেলিফোন করছেন—দোকানের মালিক বিরক্ত হন নি?

না হন নি। দোকানের মালিক আমাকে খুব পছন্দ করেন।

খুব যদি পছন্দ করে তাহলে আপনাকে দাওয়াত করেন নি কেন? আসলে আমার খুব রাগ লাগছে। আচ্ছা ভদ্রলোকের যে মেয়েটির বিয়ে হয়েছে তার নাম

==================================================

কি?

নাম তো জানি না।

নাম জিজ্ঞেস করে দেখুন। আমার ধারণা মেয়েটির নাম লায়লা।

তুমি জান কি করে?

আমি জানি না। আমি অনুমান করছি। আমার অনুমান শক্তি ভাল। আপনি জিজ্ঞেস করে দেখুন।

আচ্ছা জিজ্ঞেস করব। তোমার সঙ্গে কথা শেষ হবার পর জিজ্ঞেস করব।

জিজ্ঞেস করতে আবার ভুলে যাবেন না যেন।

না ভুলব না। এখন টেলিফোন রাখি?

এক মিনিট ধরে রাখুন। কোনও কথা বলতে হবে না শুধু ধরে রাখুন। এক মিনিট পার হবার পর রিসিভার রেখে দেবেন।

আচ্ছা।

এক মিনিট শুধু শুধু টেলিফোন ধরে রাখতে বলছি কেন জানেন?

না।

আচ্ছা থাক জানতে হবে না।

মিসির আলি ঘড়ি ধরে এক মিনিট টেলিফোন রিসিভার কানে রাখলেন তারপর রিসিভার নামালেন। মিতা স্টোরের মালিক ইদ্রিস উদ্দিন হাসি মুখে বললেন--টেলিফোন শেষ হয়েছে?

জ্বি।

আপনার জন্যে চা বানাতে বলেছি। চা খেয়ে যান। চায়ে চিনি খান তো?

জ্বি খাই।

মিসির আলি বললেন, আপনার যে মেয়েটির বিয়ে হল তার নাম কি?

তার নাম আফরোজা বানু। আমরা লায়লা বলে ডাকি। মেয়ের বিয়েতে আপনাকে বলার খুব শখ ছিল। আপনার ঠিকানা জানি না কার্ড দিতে পারি নি। আপনাকে একদিন বাসায় নিয়ে যাব। মেয়ে এবং মেয়ে জামাইয়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব। আপনাদের দোয়ায় ছেলে ভাল পেয়েছি। অতি ভদ্র। কাস্টমস এ আছে।

যাব একদিন আপনাদের বাসায়। আপনার মেয়ে এবং মেয়ে জামাই দেখে আসব।

=========================================



---

বাড়ির সামনে লোহার গেট। গেটের পেছনে খাকি পোষাক পরা দারোয়ান। কিন্তু সব কেমন অন্ধকার। গেটে বাতি জ্বলছে না, পোর্চেও জ্বলছে না। দারোয়ানকে দেখে মনে হচ্ছে সে অন্ধকার পাহারা দিচ্ছে। বাড়ির সামনে বাগানের মত আছে। স্ট্রীট লাইটের আলোয় সেই বাগানকে খুব আগোছালো বাগান বলে মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে এই প্রকান্ড বাড়ির জন্যে কোনও মালি নেই। মিসির আলি গাছপালা চেনেন না—বোগেনভিলিয়া চিনতে পারছেন। গাছ ভর্তি ফুল তাও বোঝা যাচ্ছে। অন্ধকারের জন্যে মনে হচ্ছে গাছ ভর্তি কালো ফুল ফুটেছে।

মিসির আলি গেটের কাছে এসে দাঁড়ালেন। দারোয়ান টুল ছেড়ে উঠে এল। মিসির আলি বললেন, আমার নাম মিসির আলি। আমি নিশির সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

দারোয়ান কোমর থেকে চাবির গোছা বের করে গেট খুলল। একটা কথাও বলল না। মানুষদের অনেক অদ্ভুত স্বভাবের একটি হচ্ছে অন্ধকারে তারা কম কথা বলে। মানুষ ছাড়া অন্য সব জীব জন্তু অন্ধকারেই সাড়া শব্দ বেশি করে।

নিশি কি আছে?

দারোয়ান হঁ্যা সূচক মাথা নাড়ল। তার গলার স্বর কেমন— মিসির আলির শোনার আগ্রহ ছিল, কিন্তু সে মনে হয় কথা বলবে না।

বেল টেপা হয়েছে—কেউ সদর দরজা খুলছে না। মিসির আলি দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর হাতে পাঁচটা গোলাপ। ঢাকা শহরে এখন গোলাপ চাষ হচ্ছে। সুন্দর সুন্দর গোলাপ পাওয়া যায়। পঁচিশ টাকায় যে পাঁচটা গোলাপ কিনেছেন সেই গোলাপগুলির দিকে মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকতে হয়। ফুলের দোকানদার গোলাপের কাঁটা ফেলে দিতে চেয়েছিল— তিনি ফেলতে দেননি। কাঁটা হচ্ছে গোলাপের সৌন্দর্যের একটা অংশ। কাঁটা ছাড়ানো গোলাপকে তাঁর কাছে নগ্ন বলে

==========================================

মনে হয়।

দারোয়ান আরও একবার বেল টিপে তার টুলে গিয়ে বসল। সে মনে হয় আর বেল টিপবে না। বাকি রাতটা টুলে বসে পার করে দেবে।

ঝিঁঝি পোকা ডাকছে। ঢাকা শহরে ঝিঁঝির ডাক শোনা যায় না। এই পোকাটা কি মনের ভুলে এদিকে চলে এসেছে? ঝিঁঝি পোকার ডাক, জোনাকীর আলো, শেয়ালের প্রহর যাপন ধ্বনি কিছুই আর শোনা হবে না। সব চলে যাবে। প্রাণের বিবর্তনের মত হবে শব্দের বিবর্তন।

পায়ের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। চটি পায়ে কে যেন আসছে। নিশি? হতে পারে। বসার ঘরের বাতি জ্বলল। দরজার ফাঁক দিয়ে সেই আলো এসে পড়ল মিসির আলির গায়ে। ক'টা বাজছে দেখার জন্যে মিসির আলি তার পাঞ্জাবির হাতা গুটালেন। হাতে ঘড়ি নেই। ঘড়ি নষ্ট বলে ফেলে রেখেছেন। নতুন ঘড়ি কেনা হচ্ছে না। তিনি নিদারুন অর্থ সংকটে আছেন। পাঁচটা গোলাপ কেনার সময়ও বুকের ভেতর খচ খচ করছিল।

আসুন ভেতরে আসুন।

দরজা ধরে নিশি দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েটির পরনে কালো সিল্কের শাড়ি। সে খুব সেজেছে। কপালে টিপ। চোখে কাজল। গয়নাও পরেছে। গলায় সরু চেইনের লকেট। লকেটের মাথায় লাল একটা পাথর। সেই পাথর আধো অন্ধকারেও কেমন ঝলমল করছে। কি পাথর এটা? জিরকণ? একমাত্র জিরকণই এমন কড়া লাল হয়— এমন দ্যুতিময় হয়।

নিশি তোমার জন্যে কিছু গোলাপ এনেছি।

থ্যাংক য়্যু।

সাবধানে ধর। কাঁটা সরানো হয় নি।

নিশি ফুল হাতে নিয়ে হাসল। মিসির আলি মনে মনে বললেন—বাহ্ কি সুন্দর মেয়ে। সৃষ্টিকর্তা রূপের কলস মেয়েটির গায়ে ঢেলে দিয়েছেন।

বাবা বাড়িতে নেই। মাত্র বিশ মিনিট আগে চলে গেছেন। জরুরি কল পেয়ে তাঁকে যেতে হয়েছে। পাইলটদের এই সমস্যা— মজা করে ছুটি কাটাচ্ছে হঠাৎ ইমার্জেন্সি কল। আপনি কি ড্রয়িং রুমে বসবেন না স্টাডিতে বসবেন?

এক জায়গায় বসলেই হল।

আসুন স্টাডিতে বসি। আমাদের ড্রয়িং রুমটা এমন যে কেউ বসে স্বস্তি পায় না। আমি কিন্তু আপনার জন্যে রান্না করেছি। ভাত, ডাল, চচ্চড়ি আর ডিম ভাজা।

থ্যাংক য়্যু।

ডিম ভাজা এখনও হয় নি। ডিম ফেঁটে রেখেছি—খেতে বসবেন আর আমি

==========================================

ভেজে দেব।

আচ্ছা।

আপনার যখন ক্ষিধে হবে বলবেন ভাত দিয়ে দেব।

তোমাদের বাড়িতে কি আর লোকজন নেই?

এই মুহূর্তে শুধু আমি আর দারোয়ান ভাই আছি। আমাদের একজন কাজের মেয়ে আছে— কিসমতের মা। তার জল বসন্ত হয়েছে তাকে ছুটি দিয়েছি। সে দেশের বাড়িতে চলে গেছে। সে কবে আসবে কে জানে। মনে হয় আসবে না। আমাদের বাড়িতে যারা কাজ করে তারা ছুটিতে গেলে আর ফিরে আসে না।

নিশি মিসির আলিকে স্টাডিতে নিয়ে বসাল। মাঝারি আকৃতির ঘর। হাল্কা সবুজ কার্পেটে মেঝে মোড়া। দু'টা চেয়ার মুখোমুখি বসান। একটা চেয়ারের পাশে এ্যাশট্রে।

আপনি যে ভাবে বসেন, সেই ভাবে আরাম করে বসুন। পা তুলে বসুন। আজ আপনি আসুন আমি তা চাচ্ছিলাম না। কেন বলুন তো?

বলতে পারছি না।

আমি আপনাকে খুব ভাল করে খাওয়াতে চাচ্ছিলাম। কাজের মেয়েটি নেই ভাল কিছু খাওয়াতে পারব না। তবে আমি আপনাকে বাইরের খাবার খাওয়াতে চাচ্ছিলাম না। যা পেরেছি রেঁধেছি।

আমার জন্যে খাবার তেমন জরুরি না। অনেকে খাবার জন্যে বেঁচে থাকেন। আমি বাঁচার জন্যে খাই।

কফি খাবেন?

হ্যাঁ খাব।

বসুন কফি বানিয়ে আনি। কফি খেতে খেতে গল্প করি। আপনার কি গরম লাগছে?

না গরম লাগবে কেন?

বন্ধ ঘর তো। হাল্কা করে ফ্যান ছেড়ে দি।

দাও।

আপনি পা উঠিয়ে আরাম করে বসুন।

মিসির আলি পা উঠিয়ে বসলেন। মাথার উপর ফ্যান ঘুরছে। একটু শীত শীত লাগছে। তাই ভাল। শীতের রাতে শীত না লাগলে ভাল লাগে না।

কফি নিন।

মিসির আলি কফি নিলেন। গন্ধ থেকেই বলে দেয়া যায়— কফি খুব ভাল

===============================================

হয়েছে।

ব্রাজিলের কফি বীনের কফি। আমার বাবার খুব প্রিয়।

কফি ভাল হয়েছে।

আমাকে কেমন দেখাচ্ছে তা তো বললেন না।

তোমাকে অপূর্ব লাগছে।

আপনি আসবেন এই জন্যেই সন্ধ্যা থেকে সাজ করছি। আপনি যখন বেল টিপলেন তখন আমার টিপ দেয়া শেষ হয় নি। এই জন্যেই দরজা খুলতে দেরি হল। কালো রঙ কি আপনার পছন্দ?

হ্যাঁ পছন্দ। খুব পছন্দ।

আমাকে দেখে কি আপনার শীত শীত লাগছে না?

কেন বল তো?

শীতকালে সিল্কের শাড়ি পরা কাউকে দেখলে শীত শীত লাগে। যে শাড়ি পরে আছে তার শীতটা যে দেখছে তার গায়ে চলে আসে।

তোমার পর্যবেক্ষণ শক্তি ভাল।

আপনার চেয়েও কি ভাল?

মিসির আলি সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন—আমি যে সব কিছু খুব খুঁটিয়ে দেখি তা কিন্তু না। এই কাজটা লেখকরা করেন। সবকিছু দেখেন ক্যামেরার চোখে। যা দেখছেন তারই ছবি তুলে ফেলছেন।

আপনি কি ভাবে দেখেন?

আমি আর দশটা মানুষ যে ভাবে দেখে সে ভাবেই দেখি। দেখতে দেখতে কোনও একটা জায়গায় খটকা লাগে। তখন খটকার অংশটা ভাল করে দেখি। বার বার দেখি।

বুঝিয়ে বলুন।

মনে কর এক টুকরা কাপড় আমাকে দেয়া হল। আমি কাপড়টা দেখব। তার ডিজাইন দেখব, রঙ দেখব, বুনন দেখব। অন্যরা যে ভাবে দেখবে সে ভাবেই দেখব। দেখতে গিয়ে হঠাৎ যদি চোখে পড়ে একটা সুতা ছেঁড়া তখন সকল নজর পড়বে ঐ ছেঁড়া সুতায়। তখন দেখব সুতাটা কোথায় ছিঁড়েছে কেন ছিঁড়েছে।

আমি যে আপনার কাছে আমার পান্ডুলিপি দিলাম সেখানেও কি আপনি ছেঁড়া সুতা পেয়েছেন?

হ্যাঁ।

বলুন শুনি।

==========================================

নিশি একটু ঝুঁকে এল। তার মুখ ভর্তি হাসি। মনে হচ্ছে সে খুব মজা পাচ্ছে। মিসির আলি বললেন— তার আগে তুমি বল তোমার কি কোনও বোরকা আছে? সউদি বোরকা যেখানে শুধু চোখ বের হয়ে থাকে।

নিশি শান্ত গলায় বলল, হ্যাঁ আছে।

মিসির আলি সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে বললেন—তাহলে বলা যেতে পারে তোমার সমস্যার সমাধান আমি করেছি।

বলুন আপনার সমাধান।

সমাধান বলা ঠিক হবে না। আমি সমস্যা ধরতে পেরেছি। সমাধান তোমার হাতে।

আপনি সমস্যাটা কি ভাবে ধরলেন বলুন। গোড়া থেকে বলুন। আপনার সমস্যার মূলে পৌছার প্রক্রিয়াটা জানার আমার খুব আগ্রহ। ধরে নিন আমি আপনার একজন ছাত্রী। আপনি আমাকে বুঝাচ্ছেন। আমি আপনার কাছে শিখছি —

মিসির আলি কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন— তারপর সহজ স্বরে কথা বলতে শুরু করলেন। তার বলার ভঙ্গিটি আন্তরিক। মনে হচ্ছে তিনি তাঁর ছাত্রীকেই বুঝাচ্ছেন —

নিশি আমি যা করলাম তা হচ্ছে তোমার লেখা পড়ে গেলাম। খটকার অংশগুলি বের করলাম। যে সব জায়গায় আমার খটকা লাগল সেগুলি হচ্ছে —

ক) তুমি তোমার লেখায় কোথাও তোমার খালা, মামা, চাচা, ফুফুদের কথা আন নি। তাদের সম্পর্কে কিচ্ছু লেখা নেই।

খ) তোমাদের কোনও কাজের লোকের দোতলায় ওঠার অনুমতি পর্যন্ত নেই অথচ শরিফা নামের কাজের মেয়েকে তোমার ঘরে ঘুমুতে দেয়া হচ্ছে। কেন?

গ) শরিফার স্বামী পাগল হয়ে গেছে তাকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে পাবনা শহরে--এই খবর তুমি জানলে কি করে? তোমার জানার কথা না।

আমি অগ্রসর হয়েছি এই তিনটি 'খটকা' নিয়ে। তুমি যে কাপড় বুনেছ তার সবই ভাল শুধু তিনটা সুতা ছিড়ে গেছে। কেন ছিড়ল। ছেঁড়া সুতাগুলিকে জোড়া লাগান যায় কি ভাবে? এই তিনটি সুতার ভেতর কি কোনও সম্পর্ক আছে? তখন আমার কাছে মনে হল তোমার যদি কোনও বোরকা থাকে— সউদি বোরকা, তাহলে খটকাগুলির মধ্যে একটা যোগসূত্র তৈরি হয়। তিনটি সুতার ভেতর সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায়।

তোমার কি মনে আছে তোমার বোরকাওয়ালী এক বান্ধবীর গল্প করতে

গিয়ে তুমি নানান ধরনের বোরকার কথা বলেছ। মনে আছে?

নিশি বলল, মনে আছে।

বোরকা সম্পর্কে তুমি জান। তুমি হয়ত ব্যবহারও কর। এই তথ্যটা বেশ জরুরি।

মিসির আলি আরেকটি সিগারেট ধরালেন। নিশির মুখ হাসি হাসি। মনে হচ্ছে সে খুব মজা পাচ্ছে। মিসির আলি বললেন — নিশি আমি এক কাজ করি। আগে তোমার সমস্যাটা বলি তারপর বরং ব্যাখ্যা করি সমস্যায় কি ভাবে পৌঁছেছি।

আপনার যে ভাবে ভাল লাগে সেই ভাবেই বলুন। তবে বোরকা পরে আমি ঢাকা শহরে ঘুরে বেড়াই তা কিন্তু না। শখ করে কিনেছিলাম— একদিনই পরেছি। আচ্ছা আপনি কি বলতে চাচ্ছেন বলুন।

মিসির আলি শান্ত গলায় বললেন, তুমি হচ্ছ তোমার বাবা-মা'র পালিতা কন্যা। যে কারণে তোমার নিজের জগৎ ছাড়া বাইরের কারও সঙ্গে তোমার যোগাযোগ নেই। খালা, মামা, চাচা, ফুফুরা তোমার ভুবনে অনুপস্থিত। তোমার লেখায় তারা কেউ নেই।

তোমার অসম্ভব বুদ্ধি। তুমি খুব সহজেই ব্যাপারটা আঁচ করে ফেল। তোমার নিজের জগৎ লন্ড ভন্ড হয়ে যায়।

তোমার নীতু আন্টি সেই লন্ডভন্ড জগৎ ঠিক করতে চান। তিনি হঠাৎ মনে করেন যে তোমার একজন সার্বক্ষণিক সঙ্গী থাকলে ভাল হয়। তিনি সঙ্গী নিয়ে এলেন। শরিফাকে নিয়ে এলেন। সেই শরিফাকে থাকতে দেয়া হল তোমার সঙ্গে। কেন? তোমার নীতু আন্টি ভেবেছিলেন তুমি কারণটা ধরতে পারবে না। তুমি চট করে ধরে ফেলেছ। ভাল কথা শরিফা মেয়েটিও খুব রূপবতী।

তুমি ধরে ফেললে শরিফা তোমার বোন। হতদরিদ্র এই পরিবার থেকেই একসময় তোমাকে আনা হয়েছিল। শরিফা অবশ্যি কিছু জানল না। মেয়েটির বিয়ে ঠিক হয়ে গেল। তুমি তাকে যেতে দিলে না। ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলে। প্রবল অপরাধবোধ তোমাকে গ্রাস করল। তুমি সেই অপরাধবোধের কারণেই বোরকা পরে একদিন দেখতে গেলে বোনের স্বামীকে। কিছু একটা তুমি তার সঙ্গে করেছ — সেটা কি আমি জানি না। মনে হয় ভয়ংকর কিছু। বোনের কাছ থেকে শোনা শারীরিক গল্পগুলি তোমাকে প্রভাবিত করতে পারে। তুমি নাটকীয়তা পছন্দ কর। আমার ধারণা তুমি তার সঙ্গে বড় ধরনের কিছু নাটকীয়তাও করেছ। এই মুহূর্তে আমার যা মনে হচ্ছে তা হল তুমি তোমার বোনের শাড়ি পরে— বোন সেজেই তার কাছে গিয়েছ। এমন কাজ তুমি কর। শরিফা সেজে তুমি হাসিব নামের একজনকে ভয়

==================================================

দেখিয়েছ। যদিও আমার ধারণা ভয় দেখানো তোমার উদ্দেশ্য ছিল না। তুমি গভীর রাতে তার কাছে উপস্থিত হতে চেয়েছিলে। তাই না?

জানি না।

ভয় পাবার পর হাসিব কি করল?

তিনি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন।

তুমি কি তার জ্ঞান ফেরা পর্যন্ত সেই ঘরে ছিলে?

না আমি চলে এসেছিলাম।

জ্ঞান ফেরার পর কি হল?

জানি না কি হল। আমি ঘর থেকে নামি নি। দোতলা থেকে শুনেছি খুব হৈ চৈ হচ্ছে। সকাল বেলা হাসিব বাসা ছেড়ে চলে যান।

কাউকে কিছু বলে যায় নি?

বাবাকে বলে গেছেন। আমাকে কিছু বলে যান নি।

তার থেকে কি আমরা ধারণা করতে পারি যে সে বুঝতে পেরেছিল শরিফা নয় গভীর রাতে তুমি তার ঘরে উপস্থিত হয়েছিলে?

নিশি চুপ করে রইল।

তুমি কি পরে তাকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছ।

করেছি। পাইনি। যে কম্পিউটারের দোকানে তিনি কাজ করতেন সেখানেও তিনি আর ফিরে যান নি।

তুমি যদি চাও আমি তাকে খুঁজে বের করার একটা চেষ্টা করতে পারি। হারানো মানুষ খুঁজে বের করার ব্যাপারে আমার নাম আছে। তুমি কি চাও?

না আমি চাই না। খাটের নীচে যে আমি শরিফাকে দেখতাম সেই সম্পর্কে বলুন। আপনার ধারণাটা কি শুনি।

তুমি যে খাটের নীচে অনেক কিছু দেখতে পাও এইসব সত্যিও হতে পারে আবার মিথ্যাও হতে পারে। তোমার মাথার একটা অংশ এখন কাজ করছে না। সেই অংশ নানান ছবি তৈরি করে তোমাকে দেখাচ্ছে। তবে দেখালেও তুমি জান— এইসব মায়া। তুমি অসাধারণ বুদ্ধিমতি একটি মেয়ে। তুমি বুঝতে পারবে না তা না।

আমার ছোট মা, এবং বাবা এরাও কিন্তু শরিফাকে দেখেছেন।

শোন নিশি আমি তো ওদের সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি না। আমি মাথা ঘামাচ্ছি তোমার সমস্যা নিয়ে। তুমি কি দেখছ না দেখছ সেটা নিয়েই বিচার-বিবেচনা হবে। আমার এখন ক্ষিধে লেগেছে, আমাকে খেতে দাও।

নিশি নড়ল না, বসেই রইল।

মিসির আলি বললেন, তোমার জীবনটা কাটছে একটা তন্দ্রার মধ্যে। তুমি যা ভাবছ যা করছ তা আর কিছু না — তন্দ্রাবিলাস। তন্দ্রাবিলাস নামটা খুব সুন্দর মনে হলেও তন্দ্রবিলাসের জগৎটা মোটেই সুন্দর না। ভয়াবহ ধরনের অসুন্দর। এই জগতের সবচে বড় সমস্যা হচ্ছে এ জগতের বাসিন্দারা মনে করে তাদের জগৎটাই সত্যি। যা আসলে সত্যি না। আমি মনে প্রাণে কামনা করি — তন্দ্রাবিলাসের জগৎ থেকে তুমি একদিন বের হয়ে আসবে।

নিশি নড়ে বসল। মিসির আলি বলেন, তুমি কিছু বলবে?

নিশি চাপা গলায় বলল, আপনি কি আমার সঙ্গে একটু আসবেন?

কোথায় যাব?

আমার শোবার ঘরে।

কেন?

শরিফা আমার ঘরে বসে আছে। আপনি তাকে দেখবেন তার সঙ্গে কথা বলবেন।

আমি দেখতে চাচ্ছি না নিশি। তোমার ভয়ংকর জগতের অংশ আমি হতে চাই না।

আসুন না প্লীজ।

না। শোন নিশি আমি যখন না বলি তখন সেই 'না' কখনও হ্যাঁ হয় না। ঐ প্রসঙ্গ থাক। ভাল কথা তুমি যে ঐ দিন টেলিফোনে ফট করে বলে দিলে দোকানের মালিকের মেয়ের নাম লায়লা — কি ভাবে বললে? আমি অনেক চিন্তা করেও বের করতে পারি নি।

আমি যদি বলি শরিফা আমাকে বলেছে আপনি কি বিশ্বাস করবেন?

না।

আপনার ক্ষিধে পেয়েছে আসুন খাবার দি।

মিসির আলি খুব তৃপ্তি করে খেলেন। সামান্য খাবার কিন্তু খেতে এত ভাল হয়েছে।

আলু ভর্তার উপর মেয়েটি গাওয়া ঘি ছড়িয়ে দিল। গন্ধে চারদিক ম ম করছে।

আপনাকে কি শুকনো মরিচ ভেজে দেব? একটা বইয়ে পড়েছিলাম ভাজা শুকনো মরিচ আপনার খুব পছন্দ।

দাও।

নিশি মরিচ ভেজে নিয়ে এল। কি যত্ন করেই না মেয়েটি তার প্লেটে খাবার তুলে দিচ্ছে। মিসির আলি হঠাৎ লক্ষ্য করলেন মেয়েটির চোখ দিয়ে টপ টপ করে পানি পড়ছে।

একবার তাঁর ইচ্ছে হল নিজের হাতে মেয়েটির চোখের জল মুছে দেন— পর মুহূর্তেই মনে হল— না, নিশির চোখের জল মুছিয়ে দেবার দায়িত্ব তাঁর না। তাঁর দায়িত্ব জলের উৎস মুখ খুঁজে বের করা। এই কাজটা তিনি করেছেন। তাঁর দায়িত্ব শেষ হয়েছে। মেয়েটি যদি তার চোখের জল মুছতে চায় তাহলে তাকেই তা করতে হবে।